৮.০১ অন্ধকারের আতঙ্ক – Bangla Library

৮.০১ অন্ধকারের আতঙ্ক – Bangla Library

অন্ধকারের আতঙ্ক

তোমাকে যেতেই হবে মিঃ নিয়াজের বাসায়। শুনতে হবে সব কথা। আরমান বড় ভাল ছেলে, আমার নূরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, শুধু বন্ধুই নয় সে পরম হিতাকাঙ্খী। কথাগুলো বলে থামলো মনিরা।

বললো বনহুর—আমি সব জানি কিন্তু....

না, কোনো কিন্তু নয়, সে অনেক কথা। আমি জানি তুমি ছাড়া এ রহস্য কেউ উদঘাটন করতে পারবে না।

বেশ, তুমি যখন বলছো যাবে। কিন্তু নূরকে জানাবে না কারণ আমি সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতে আরমানদের বাসায় যাবো।

কতদিন পর মনিরা স্বামীকে পাশে পেয়েছে। অনেক কথা জমা হয়েছিলো তার মনে, সব কথা তার কোনো দিনই বলা হয়নি। বলবার মত সুযোগও আসেনি তার ভাগ্যে।

মনিরার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো বনহুর। ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো মনিরা।

সিংহাদেউড় থেকে ফিরে বনহুর কান্দাই আস্তানায় গিয়ে স্বস্তি পায়নি, কারণ অনেকদিন হলো মায়ের সংবাদ জানে না সে। স্নেহময়ী জননীর মুখ তাকে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে, তাই আস্তানার সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে আসে বনহুর চৌধুরীবাড়িতে।

জননীর সঙ্গে দেখা করার পর সে মনিরার পাশে যায়।

গভীর রাতে তাহাজ্জোতের নামাজ আদায় করে জায়নামাজে বসে দুহাত তুলে আল্লাহর নিকটে দোয়া করছিলেন মরিয়ম বেগম, ঠিক সেই মুহূর্তে পরম কামনার কণ্ঠস্বর–মা!

দু'হাত মুখে বুলিয়ে ফিরে তাকালেন মরিয়ম বেগম। আনন্দে চোখ দুটো তার দীপ্ত হয়ে উঠলো। কক্ষের স্বল্প আলোতে দেখলেন ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বড় আদরের ধন মনির।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগমবাৰা মনির।

এগিয়ে এসে মায়ের জায়নামাজের পাশে বসে বলে বনহুর–কেমন আছো মা?

মরিয়ম বেগম বললেন–কদিন হলো শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তোর সংবাদ না পেয়ে অনেক চিন্তায় ছিলাম। কেমন ছিলি বাবা?

ভাল! মা, তুমি মিছামিছি আমার জন্য চিন্তা করো। এই তো সুস্থ দেহে তোমার সম্মুখে হাজির.....।

মায়ের মন তুই বুঝবি না। সত্যি আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। তোর জন্য মনটা বড় উতলা হয়েছিলো।

তোমার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন বলেই তো শত বিপদও আমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তুমি দোয়া করছে বলেই তো আমি আছি......মা, তুমিই যে আমার সবকিছু।

মনির।

বলো? বলো মা?

নূরের বন্ধু আরমানকে তুই চিনিস?

হাঁ, কেন মা?

মনিরা সব বলবে, অত কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারবো না। যা বাবা, মনিরার ঘরে যা। বৌমার সব সময় বিষণ্ন মুখ আমাকে ভীষণ ব্যথা দেয়।

বনহুর মায়ের পাশ থেকে বিদায় নিয়ে মনিরার কক্ষে আসে।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে মনিরা।

বনহুর এসে দাঁড়ায় খাটের পাশে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে–মনিরা! মনিরা আমি এসেছি......।

অকস্মাৎ জেগে ওঠে মনিরা, চোখ মেলে চাইতেই স্বামীর মুখে দৃষ্টি পড়লো। আনন্দে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয় মনিরা।

বনহুর ওর পাশে বসে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে বলে–আবার ঘুমিয়ে পড়লে বুঝি?

মনিরা নীরব।

কথা বলছো না কেন?

কেন এলে?

আমার অধিকার আছে তাই তো এলাম।

দস্যু বনহুরের প্রবেশাধিকার সব জায়গায় সমান। বলো তোমার অধিকার কোথায় নেই। রাজকন্যার অন্দরমহল হতে ভিখারিণীর পর্ণকুটির সব জায়গায় তোমার অবাধ অধিকার। কিন্তু আমিও কি তোমার কাছে আর সবার মত। রাজকন্যা নাই বা হলাম। নাই বা হলাম রাজদুলারী……

তুমি রাজরাণী তো বটে। জানো না মনিরা আমার আস্তানায় সবাই তোমাকে রাণীজী বলে ডাকে।

সেই সৌভাগ্য নিয়েই আমি বেঁচে থাকবো এবং আছি। ওরা জানে না তাদের রাণীজী সত্যিকারের রাণীজী নয়, সে একজন ভিখারিণীর চেয়েও অধম।

মনিরা।

হাঁ সত্যি তাই।

তুমি কি চাও? আর কিই বা তোমার নেই?

ধনরত্ন অর্থের কাঙ্গাল আমি নই।

জান মনিরা মা বলছিলেন কোনো কথা আছে তোমার বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কোনোদিন কোনো প্রয়োজনীয় কথা আমার শুনেছো তুমি?

শুনিনি এবার শুনবো, বলোবলো লক্ষীটি? তাকাও আমার দিকে! বনহুর ওকে জোর করে ফিরিয়ে নেয়। মনিরা পারে না নিজকে সংযত রাখতে। বহুবার সে এমনি করে স্বামীর কাছে কঠিন হতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। এক সময় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সে স্বামীর বাহুবন্ধনে। আজও মনিরা পারে না, স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে–সত্যি বলেছো শুনবে আমার প্রয়োজনীয় কথা?

এত অবিশ্বাস কেন বলো তো? বলেই দেখো শুনি কিনা। মনিরা, তোমার কথা যদি না শুনি তবে শুনবো কার কথা? বলো?

তোমাকে রাখতে হবে আমার কথা। বলল রাখবে?

রাখবো। সত্যি রাখবো……

মনিরার মুখে সব শোনার পর বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করছিলো, এবার বললোর। জানলে আমার পক্ষে এ রহস্য উদঘাটন করা কিন্তু অসুবিধা হতে পারে।

বেশ, আমি তো বলেছি ওকে জানাবো না।

আমি আরমানদের বাসায় গেছি বা এসব জেনেছি, এ কথা শুধু নূর কেন, কেউ জানুক আমি তা চাই না।

বললাম তো তাই হবে। মনিরা স্বামীর জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বললো কথাটা। তারপর বললো মনিরা–মা চা-নাস্তা তৈরি করে ফেলেছেন। খেয়েই রওয়ানা দেবে! রাত ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ।

আচ্ছা তোমার কথামতই কাজ করবো।

বনহুর আর মনিরা যখন আরমানদের বাসায় এলো তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

মিঃ নিয়াজী অভ্যর্থনা জানালেন।

মনিরা-কিন্তু বনহুকে স্বামী বলে পরিচয় না দিয়ে আত্নীয় বলে পরিচয় দিলো এবং সব কথা খুলে বলার জন্য মিঃ নিয়াজীকে অনুরোধ জানালো।

মিঃ নিয়াজী বললেন–মিঃ আসলাম চৌধুরী আপনার, সংগে আমার ছেলে আরমানের পরিচয় হওয়া দরকার ছিলো এবং তার মুখেই সব শুনতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বাসায় নেই।

বনহুর এখানে নিজের নাম আসলাম চৌধুরী বলেছিলো। মনিরাকেও শিখিয়ে দিয়েছিলো, সে যেন মিঃ চৌধুরী বলেই পরিচয় দেয়।

মনিরা স্বামীর নির্দেশমতই কাজ করেছে।

বনহুর সম্বন্ধে মিঃ নিয়াজী জ্ঞাত থাকলেও তিনি এতদূর জানেন না যে, নুরুজ্জামানের পিতা স্বয়ং দস্যু বনহুর। এ রকম ধারণাও তার মনে ছিলো না।

মিঃ নিয়াজী যখন বললেন, আরমান বাসায় নেই তখন বনহুরের মুখমন্ডল চিন্তাযুক্ত হলো।

মিঃ নিয়াজী লক্ষ করলেন এবং তিনি বললেন–মিঃ চৌধুরী, আপনি কিছু ভাববেন না। আমার ছেলের সহকারী রবিন এখানে আছে, তার কাছে আপনি সব জানতে পারবেন, কারণ রবিন শুধু আরমানের সহকারীই নয়, বন্ধুও বটে এবং সে কারণে রবিনকে আরমান সব কথা বলেছে। কাহিনীটা রবিন বুঝিয়ে বলতে পারবে।

বনহুর বললো—সবচেয়ে ভাল হতো আরমানের মুখে সব জানতে পারলে। তবে আপনি বলছেন রবিন সব জানে কারণ আরমান রবিনকে তার সমস্ত ঘটনা বলেছে। বেশ ডাকুন, তার মুখেই সব জানবো।

মনিরা বললো—মিঃ নিয়াজী, আপনার ছেলে আমার ছেলে নূরের বন্ধু, কাজেই তার এই বিস্ময়কর ঘটনা শোনার পর আমি ভীষণ চিন্তিত, কাজেই......

মিঃ নিয়াজী বললেন–আমি জানি আপনি আমার সন্তান আরমানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং সেই কারণেই আপনার আত্নীয় ডিটেকটিভ মিঃ চৌধুরীকে সংগে নিয়ে এসেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

মিঃ নিয়াজী রবিনকে ডাকলেন।

অল্প সময়ে রবিন এলো।

চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে, ঠিক নূরের মতই বয়স হবে। ধীর শান্ত তার চেহারা, চোখেমুখে বুদ্ধিদীপ্ত ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বনহুরকে অভিবাদন জানালো রবি।

বনহুরের মুখে দাড়ি ছিলো, চোখে কালো চশমা। মাথায় ক্যাপ, প্যান্ট টাই কোট পরা বনহুরকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো বনহুর।

এমন কি মনিরাও তাকে চিনতো না যদি বনহুর তার সামনে ছদ্মবেশ ধারণ না করতো। বনহুর অবশ্য এই বেশেই চৌধুরী বাড়িতে এসেছিলো।

আজকাল চৌধুরীবাড়ীতে পুলিশ পাহারা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ সুদীর্ঘ সময় বনহুরের আবির্ভাব কান্দাই নগরীতে ছিলো না।

তাই বনহুর সহজেই আগমন করতে সক্ষম হয়েছে প্রকাশ্য সদর গেট দিয়ে গাড়িযোগে। যদিও মনিরার কক্ষে গোপন চোরাপথ আছে সে পথে আসেনি সে এবার।

বনহুর রবিনকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ করলো, তারপর বললো–বসো! হাঁ, আমি কিন্তু তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করলাম।

একটু হেসে বললো রবিন–নিশ্চয়ই। আমি তো আপনার চেয়ে বয়সে অনেক কম, আমাকে আপনি বলা ভাল দেখাবে না।

রবিন আসন গ্রহণ করলো।

মনিরা বললো–আমি জানি রবিন সব বলতে পারবে।

মিঃ নিয়াজী বললেন-বলল রবিন, যা তুমি জানো সব বলো।

হাঁ আমি বলবো, অবশ্য আরমান থাকলে ভাল হতো।

আমি জানি তুমি সব জানো কারণ আরমান তোমাকে সব খুলে বলেছে। সব শুনে যদি মিঃ চৌধুরী কিছু ক্লু পান এ ব্যাপারে।

রবিন বলতে শুরু করলো এক সঙ্গেই আমরা লেখা পড়া করতাম তারপর একদিন পড়াশুনার কারণেই আরমান বিদেশ গেলো। আমি ব্যবসা শুরু করলাম। কাঠের ব্যবসা আমার, প্রায়ই আমাকে মিঃ আব্বু নিয়াজীর সঙ্গে যেতে হতো বিভিন্ন জঙ্গলে।

বনহুর তাকালো মিঃ নিয়াজীর মুখের দিকে।

তিনি পাইপ টানছিলেন গম্ভীর কণ্ঠে, বললেন–হাঁ, আমি রবিনকে নিয়ে কাজ শুরু করলাম। অনেক সময় ওকে নিয়ে আমি বহু দূরদূরান্তে কাঠের সন্ধানে গেছি। হাঁ, বলো তারপর?

রবিন বলতে শুরু করলো আবার–মিঃ আব্বু নিয়াজী আমাকে তার সন্তানসম স্নেহ করেন, এ কারণেই হয়তো তিনি আমাকে সংগে নিলেন। আমিও বেকার জীবন থেকে রেহাই পেলাম।

একদিন ফিরে এলো আরমান। মিসেস মনিরা চৌধুরীর একমাত্র সন্তান নূরুজ্জামান সহ দেশে ফিরে এলো আরমান। আমি তখন ব্যবসায় তলিয়ে গেছি। আরমান প্রায়ই নুরুজ্জামানের ওখানে যেতো এবং প্রায়ই সে রাত করে বাড়ি ফিরতো। একবার নুরুজ্জামান অন্তর্ধান হয় তখন সে তার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে, তারপর সেও হঠাৎ উধাও হয়......এসব কাহিনী হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন।

মিঃ আব্বু নিয়াজী বললেন–হ্যাঁ, তুমি শুধু ঐটুকু বলো যা আরমানের জীবনে এক নতুন পরিবর্তন এনেছে।

বেশ বলছি। রবিন বলতে লাগলো। হঠাৎ একদিন আরমান কাঠের সন্ধান পেয়ে বেরিয়ে পড়লো। নতুন এক জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে সে।

শহর ছেড়ে বহুদূর এসে পড়ে আরমান।

এ পথে লোক চলাচল বড় একটা করতো না। পথটা নির্জন তবে প্রশস্ত এবং মজবুত।

শহর থেকে বেরিয়ে পথটা চলে গেছে বনবাদাড় পেরিয়ে এক বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে। হঠাৎ আরমানের দৃষ্টি পড়লো প্রান্তরের মধ্যে একটি ডাকবাংলো অথবা সরাইখানা।

আরমান সেই সরাইখানা লক্ষ করে গাড়ি চালিয়ে চললো। কারণ বহুক্ষণ সে একটানা গাড়ি চালিয়ে এসেছে।

তার গাড়িতে কোনো ড্রাইভার ছিলো না।

আরমান নিজেই গাড়ি চালিয়ে এততটা পথ এসেছে, তাই ক্লান্ত ছিলো সে।

সরাইখানার সামনে এসে গাড়ি থেকে নামলো আরমান। তারপর সেই সরাইখানায় রাতের মত আশ্রয় নিলো। কারণ নির্জন পথে সন্ধ্যার পর গাড়ি

চালিয়ে যাওয়া সে সমীচীন মনে করলো না। তা ছাড়া আরমান বড় ক্লান্তি বোধ করছিলো।

সরাইখানায় একটি কক্ষে তাকে থাকতে দেওয়া হলো। সুন্দর পরিচ্ছন্ন কক্ষ, সাদা ধবধবে বিছানা। সাধারণ সরাইখানায় এ ধরনের ব্যবস্থা আরমানকে মুগ্ধ করলো।

আরমান খুব ক্লান্ত ছিল তাই বিছানায় শয়ন করতেই অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমালো ঠিক নেই।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো আরমানের। চমকে তাকালো, বিস্ময় নিয়ে দেখলো তার চারদিকে ধুমরাশি আচ্ছন্ন করে ফেলছে। হঠাৎ এত ধোয়া কোথা থেকে এলো বুঝতে পারে না আরমান।

ঘুমাবার পূর্বেও কক্ষটার মধ্যে কোনো কিছু ছিলো না। পরিচ্ছন্ন কক্ষটার মধ্যে দুগ্ধফেনিল শয্যায় শয়ন করেছিলো সে।

আরমান শয্যায় উঠে বসলো।

চারদিকে তাকালো সে ভালভাবে।

কিছু দেখতে পাচ্ছে না আরমান, শুধু ধোয়া ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না।

ক্রমে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আরমানের।

চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আসছে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো আরমান, কিন্তু কতক্ষণ হাতে মুখ ঢেকে এই ধূম্ররাশি থেকে নিজকে রক্ষা করবে সে। মুখ থেকে হাত দুখানা সরিয়ে নিলো, তারপর ভালভাবে তাকালো আরমান রাশির দিকে। আরমানের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ধূম্ররাশির মধ্যে কুন্ডলি পাকিয়ে একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে।

ভয়ে বিস্ময়ে আরষ্ট হয়ে গেলো আরমান।

ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কেমন যেন বিরাট মাথা।

মাথা আর মুখ স্পষ্ট নজরে না পড়লেও আরমান দেখলো ছায়ামূর্তির মুখমন্ডল বিকৃত, নাকটা বৃহৎ, কপালের নিচে গোল গোল দুটি চোখ।

সে চেহারা কোনো মানুষের বলে মনে হলো না।

তবে দেহটা সম্পূর্ণ মানুষেরই বটে।

মিঃ আরমান চোখ বন্ধ করলো, ভয়ে আড়ষ্ট হলো সে।

একি সত্যি না স্বপ্ন!

সেকি তবে স্বপ্ন দেখছে!

না স্বপ্ন নয়।

এই তো সে জেগে উঠেছে। সমস্ত শরীর ঘেমে উঠছে। কাঁপছে তার দেহটা।

ভালভাবে তাকাতেই শিউরে উঠলো আরমান। ছায়ামূর্তিটার হাতে বিরাট আকার একটি সিরিঞ্জ, সিরিঞ্জের সূচটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবার। ধূম্ররাশি কিছুটা হালকা ছিলো তার খাটের পাশে, তাই ছায়ামূর্তির হাতের বস্তুটা তার নজরে পড়লো ভালভাবে।

ভয়ংকর ছায়ামূর্তিটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেমন যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ। কোন বস্তুর মধ্য হতে শব্দটা যেন বেরিয়ে আসছে। অতি নিকটে এসে গেছে।

আরমান চোখ বন্ধ করে ফেললো।

তারপর আর কিছু খেয়াল নেই ওর।

ভীষণ শব্দে সংজ্ঞা হলো আরমানের।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে বয় ডাকছেস্যার, স্যার স্যার…

আরমান দরজা খুলে দিলো।

বয়ের হাতে চা-নাস্তার ট্রে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে বয় আরমানের মুখের দিকে। ওর দৃষ্টিতে রাশিকৃত বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

আরমান বললো–কি দেখছো অমন করে?

নিজকে সামলে নিলো বয়টা, ঢোক গিলে বললো–স্যার, অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে ডাকছি কিনা তাই। বেলা অনেক হলো, চা-নাস্তা যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে স্যার!

চোখ রগড়ে বললো আরমান—বড় ঘুমিয়েছিলাম। তারপর আপন মনে বললো সে– আমি তাহলে বেঁচে আছি!

বয় বললো—কি বললেন স্যার?

না কিছু না। সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিলো বয়কে। বয় কক্ষে প্রবেশ করে টেবিলে ট্রে রাখলো, তারপর বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বললো আরমান —এই শোনো।

বয় থমকে দাঁড়িয়ে চোখ দুটি তুলে ধরলো আরমানের মুখের দিকে।

আরমান বললো—বসো। ঐ টুলটায় বসো। একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আরমান তাকে বসতে বলায় অবাক হলো বয়টা। তবু সে বসলো সঙ্কোচিতভাবে টুলটার ওপরে।

খাটের এক পাশে বসলো আরমান।

আরমান বললো–তোমার নামটা কিন্তু শোনা হয়নি। তোমার নাম কি?

আমার নাম মংলু!

বেশ সুন্দর নামটা তোমার মংলু। আচ্ছা মংলু!

বলুন?

তুমি এ সরাইখানায় কতদিন আছো?

প্রায় এক বছর।

তোমার বাড়ি কোথায়?

বয় সরাইখানার জানালা দিয়ে বাহিরে দূরে অনেক দূরে পাহাড়ের পাদমূলে কতকগুলো বস্তি এলাকার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঐ যে পাহাড়টা দেখছেন ওর নিচে। আমার বাবা এখানে মালির কাজ করে।

ওঃ তুমি তাহলে মালির ছেলে?

হাঁ স্যার, আমি মালির ছেলে!

একটা কথা বলবো তোমাকে

বলুন স্যার?

এ সরাইখানায় কোন ভূতপ্রেত আছে নাকি?

আরমানের কথায় কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো মংলুর মুখমন্ডল। ভীতভাবে তাকালো সে আরমানের মুখের দিকে।

আরমান বললো—কি ভাবছো?

না স্যার, কিছু ভাবছি না।

আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করলাম তার জবাব দিলে না কেন?

কি কথা?

এই সরাইখানায় ভূত আছে?

স্যার, আপনি কিছু দেখেছেন?

হ্যাঁ, সে এক ভয়ংকর মুখ..

স্যার, আমার শরীর কাঁপছে। যে ব্যক্তি এই ডাকবাংলোয় আসেন সবাই দেখেন, সবাই সংজ্ঞা হারান কিন্তু সংজ্ঞা আর ফিরে আসে না তাদের কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হন, কেউ পাগল হয়ে যান। স্যার আপনি.....

আমি এখনও বেঁচে আছি এবং সজ্ঞানে আছি তাই আশ্চর্য হচ্ছে, তাই না মংলু?

আমার শরীর কাঁপছে, স্যার।

কোনো ভয় নেই, এখন আমি তো তোমার পাশে আছি। রাতে আমি যখন একা ছিলাম তখন এসেছিলো এক ভয়ংকর মূর্তি। মূর্তিটা জীবন্ত, রাশিকৃত ধোঁয়ার মধ্যে মূর্তিটা এগিয়ে আসছিলো আমার দিকে।

স্যার, আপনিও তাহলে দেখেছেন?

হাঁ দেখেছি, তাই তো তোমাকে জিজ্ঞসা করছি। আচ্ছা বলো তো মংলু, কি ব্যাপার?

বলতে মানা আছে!

মানা আছে?

হাঁ স্যার।

কে মানা করেছে।

এ বাংলোটা যার। আসলে তো এটা ডাকবাংলো নয়, এটা একটা সরাইখানা। দেখছেন স্যার প্রান্তরের মধ্যে একটি বিশ্রামস্থল।

হাঁ তা ঠিক, বাংলো না হয়ে এটা সরাইখানা হলেও তাতে কিছু বলবার নেই আর সরাইখানাকেও ডাকবাংলো বললে তাতেও কিছু যায় আসে না।

স্যার, এ পথে যারা যান আসেন তারা এই সরাইখানাতে বিশ্রাম করেন এবং রাত্রি যাপনও করেন। যারা দিনে দিনেই ফিরে যেতে পারেন তারা ভাগ্যবান। একটু থেমে বললো—-বেশির ভাগ পথিককে এখানে আসতেই হয়, কারণ এ পথে আর কোনো সরাইখানা বা বিশ্রামস্থান নেই।

তা তো জানি। একে দূরের পথ তারপর আশেপাশে কোনো লোকালয় নেই।

হাঁ স্যার, তাই ইচ্ছা না থাকলেও আসতে হয়।

আচ্ছা মংলু, সরাইখানার মালিক কোথায় থাকেন বলতে পারো?

পারি তবে সঠিক ঠিকানা জানি না। শুনেছি তিনি শহরে থাকেন। মস্ত বড় পাঁচ পাঁচটা বাড়ি আছে তার শহরে। তা ছাড়া গাড়িও আছে। মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে সরাইখানায় আসেন আবার চলে যান।

তাই নাকি?

হা স্যার।

আরমান একটা শব্দ করলো–হু। মংলু?

বলুন স্যার?

আমাকে এখানে আরও কয়েক রাত থাকতে হবে।

সর্বনাশ স্যার! ঐ কাজ করবেন না..

কেন?

ভালয় ভালয় রাতটা কেটে গেছে তবু বেঁচে আছেন। কিন্তু......

থামলে কেন, কিন্তু কি বলো?

না স্যার, বলতে পারবো না।

বলো, নির্ভয়ে বলো।

স্যার, কাল রাতে বেঁচে গেছেন কিন্তু আজ রাত আর আপনার কাটবে না।

এর বেশি আর কিছু বলতে পারবো না স্যার। একটু থেমে মংলু বললো—- আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আপনি সত্যি বড় সুন্দর, বড় সুন্দর

আপনার চোখ দুটো। আপনার গলার স্বর ভারী সুন্দর।

বয়ের কথায় হাসলো আরমান।

আপনি হাসলেন আমার কথা শুনে?

হাঁ, কারণ তুমি আমার বন্ধু হলে আজ থেকে।

আমি–আমি আপনার বন্ধু!

তাতে কি আছে?

আমি বয়......

তুমি তো মানুষ, সেই মানুষ, হিসেবেই আমার বন্ধু তুমি।

স্যার!

কোনো ভয় নেই, এখন থেকে তুমি আমার পরম বন্ধু। আচ্ছা যাও মংলু, একটু পরে এসে কাপ আর প্লেট নিয়ে যেও।

মংলু বেশ অবাক হয়ে গেছে। লোকটা বলে কি! তিনি তো একজন বড়, মস্ত বড় সাহেব। আর সে কি না একটা মূর্খ সাঁওতাল তরুণ। মংলু মাথা নত করে বেরিয়ে গেলো। সব যেন তার কাছে আশ্চর্য লাগছে। এই সরাইখানায় সে হোটবেলা থেকেই তার বাপের সঙ্গে আসে যায়। বাপু মালির কাজ করতো আর সে বসে বসে বাপুকে সাহায্যে করতো। সরাইখানাটা তার বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলো দিনের পর দিন। তারপর যখন সে একটু বড় হলো, তখনও সে তার বাপুর সংগে আসতো। বাগানের কাজ করতো, মাঝে মাঝে তাকে সরাইখানার ভেতরের কাজ করতে হতো। ঝাড় দেওয়া, দেয়ালের ঝুল ঝাড়া, টেবিল পরিষ্কার করা, বাবুরা এলে তাদের ফাই-ফরমাস খাটা-এ সবই সে করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলো এক সাহেব সরাইখানার কামরায় মৃত অবস্থায় শায়িত আছেন। লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে এ সরাইখানা, তাই সাহেবের মৃত্যু সংবাদ কেউ জানলো না। তাকে পুঁতে ফেলা হলো সরাইখানার অদূরে বালুর মধ্যে। তারপর থেকে কত সাহেব এলেন, যারা রাতে মানে সন্ধ্যায় আসেন তারা আর সরাইখানা থেকে ফিরে যেতে পারেন না-হয় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নয় পাগল

অবস্থায় বেরিয়ে আসেন। তারপর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাগলা গারদে। এর পর আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। মংলু প্রথম প্রথম ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেও এখন আর ভয় পায় না, দেখে দেখে সব তার সয়ে গেছে। আজ সে সরাইখানায় বয়ের চাকরি পেয়েছে। ভাল মাইনে পায়। মংলুর কাছে সব রহস্যময় মনে হলেও সে তা প্রকাশ করে না। অবশ্য সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলো তার বাপুকে। বাপু সাঁওতালদের সর্দার, তাকে সবাই ভয় করে, মেনেও চলে, মংলুও ভয় করে তবু সে জিজ্ঞাসা করেছিলো-বাপু, সরাইখানায় যারা আসে তারা মরে যায় কেন? বলেছিলো সর্দার-খবরদার, আর ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবি না। শুধু দেখে যাবি, বলবি না কিছু, বুঝলি? বাপুর কথামত আর কোনো দিন সে কোনো প্রশ্ন তার বাপুকে করেনি। কত ঘটনাই না ঘটে চলেছে তার সামনে কিন্তু মংলুর সাহস হয়নি তার বাপুকে কিছু জিজ্ঞাসা করে।

তবে এখন সে বুঝতে পারছে এ সরাইখানা রহস্যময় পুরী। যারা দিনে আসেন দিনে যান তাদের জন্য কোনো দুঃখ বা সহানুভূতি হয় না মংলুর, কারণ তারা যেমন আসেন তেমনি বিশ্রাম শেষে ফিরে যান সুস্থদেহে, সুস্থ মস্তিস্কে। আর যারা সন্ধ্যায় আসেন তাদের দেখেই মংলুর মুখ কালো হয়ে ওঠে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে দাহ করে চলে। বড় মায়া হয়, করুণা হয় কারণ সে জানে এরা আর ফিরে যাবেন না, পরদিন তাদের লাশ পুতে ফেলা হবে সরাইখানার পেছনে বালুভূমির মধ্যে।

মংলুর বুকটা ধক করে উঠেছে অতিথির কথা শুনে, মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, কারণ প্রথম রাতে সে রক্ষা পেলেও দ্বিতীয় রাতে সে নিশ্চয়ই রেহাই পাবে না। এমন সুন্দর একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, এটা মংলু যেন সহ্য করতে পারে না।

মংলু যখন ভাবছিলো অতিথিটিকে নিয়ে তখন অতিথি আরমান গভীরভাবে চিন্তা করছিলো পূর্ব দিনের কথা। যখন তার জীপটা এসে সরাইখানার সামনে থামলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। গাড়ি থামতেই লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসেছিলো বয়।

লণ্ঠন উঁচু করে ধরে আরমানের মুখে দৃষ্টি ফেলতেই কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছিলো মংলুর মুখমন্ডল। হয়তো বা ভেবেছিলো এমন একটা তরুণ সুপুরুষ— আজ রাতের পর আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয় মৃত্যুবরণ করবে নয় বদ্ধপাগল হয়ে হো হো করে হাসবে নাচবে তারপর কোথায় হারিয়ে যাবে, কেউ কোনোদিন আর তার সন্ধান পাবে না।

ভাবছে আরমান, মংলু তাকে দেখে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলো। তার কারণ কি? নিশ্চয়ই সে এই ধুম্রকুন্ডলির মধ্যের ছায়ামূর্তির রহস্য সবকিছু জানে যা সে তাকে বললো না। গভীর এক রহস্য লুকিয়ে আছে এই সরাইখানার অভ্যন্তরে কিন্তু কি সে রহস্য? আরমান অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আমাকে এই রহস্য উদঘাটন করতেই হবে। মংলুর কথায় বুঝতে পেরেছে, রহস্যটা সাধারণ নয়– মানুষের জীবন নিয়ে খেলা……আরমান চায়ের কাপটা তুলে নিলো হাতে। কয়েক চুমুক চা পান করতেই একি! শরীরটা কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে উঠলো। মনে হচ্ছে সমস্ত শিরায় শিরায় একটা আলোড়ন।

আরমান চায়ের কাপটা রেখে দিলো।

উঠে দাঁড়ালো সে।

কেমন যেন লাগছে তার।

তবে কি চায়ের মধ্যে কিছু মেশানো হয়েছিলো?

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো নিজের হাতের কজায় একটা লাল দাগ, ঠিক কজার মাঝামাঝি রগটার ওপরে।

আরমান বুঝতে পারলো রাতে সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্তি তার হাতের কজার ইনজেকশান পুশ করেছে। তারপর, তারপর চায়ের মধ্যে কিছু ছিলো, ইনজেকশান এবং এই চায়ের মধ্যে মেশানো ওষুধের ক্রিয়া শুরু হয়েছে……

আরমান ক্ষিপ্তভাবে পায়চারী শুরু করলো, তবে কি সে পাগল হয়ে যাচ্ছে, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে…হয়তো তাই হবে। মংলু যা বলে গেলো তাই সফল হতে চলেছে, মৃত্যু তার ঘটেনি কিন্তু পাগল হওয়ার লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে কি পাগল হবেই সে…অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আরমান্ব!সত্যি সে পাগল হবে না হবে না, সে নিজকে সংযত রাখবে। আরমান চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখালো, তারপর রাখলো টেবিলে।

উঠে দাঁড়ালো আরমান।

হঠাৎ সে চৌকিটা ধরে উঁচু করে তুললো তারপর রেখে দিল, প্রচন্ড একটা শক্তি যেন তার দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। জানালার মোটা শিকটা ধরলো,

আলগোছে শিক খুলে এলো হাতের মুঠায়।

আরমান নিজের হাতের কজায় তাকালো। আপন মনে হাসলো সে।

আরমান যখন জানালার মোটা শিকগুলো আলগোছে খুলে ফেলে দিলো জানালার বাইরে, ঠিক ঐ সময় কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো মংলু। সে এই দৃশ্য লক্ষ করে শিউরে উঠলো। দু'চোখ তার ছানাবড়া হয়ে উঠছে। মুখটা হা হয়ে গেছে, এমন বিস্ময়কর ব্যাপার সে কোনো দিন দেখেনি বা শোননিনি। সরাইখানার শিক সাধারণ শিক নয়, এত মজবুত মোটা লোহার শিক যা সাধ্য নেই কেউ বাঁকা করে হাত দিয়ে।

মংলু ভায়ে বিস্ময়ে ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই আরমান বললো–এই শোনো

মংলু থমকে দাঁড়ালো।

বললো–স্যার!

আরমান বললো–কি ফিরে যাচ্ছো কেন?

স্যার, আপনি দুপুরে কি খাবেন জানতে এসেছিলাম!

তা না জেনেই যাচ্ছিলে কেন?

স্যার! ভীত নজরে তাকালো মংলু আরমানের মুখের দিকে।

আরমান মংলুর দিকে এগিয়ে এলো, তারপর বললো—তুমি আমার বন্ধু, কাজেই কেন তুমি ভয় পাচ্ছো?

মংলু তখনও ভীত চোখে তাকাচ্ছিলো আরমানের দিকে। আরমানের মুখে হাসি এবং তার স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে অনেকটা সাহস হলো মংলুর।

এগিয়ে এলো সে আরমানের পাশে।

বললো–আরমান। যাও খাবার নিয়ে এসো।

কি খাবেন স্যার, মাংস না মাছ?

যা ভাল মনে করো তাই এনো। আর শোনো, আমার খাবার জন্য যা আনবে, তা গরম না করে আনবে না।

আচ্ছা স্যার আপনার কথা স্মরণ থাকবে। চলে গেলো মংলু।

আরমান সরাইখানায় সে রাতও কাটাবে বলে রয়ে গেলো।

সন্ধ্যায় মংলু এসে চা দিয়ে গেলো আর বলে গেলো—স্যার, সাবধানে থাকবেন।

আচ্ছা।

কাল ভোরে আপনি জীবিত থাকবেন কিনা কে জানে।

কোনো চিন্তা করো না। আল্লাহ সহায় আছেন।

চলে গেলো মংলু।

আবার রাতে খাবার সময় মংলুর সাক্ষাৎ মিললো। মংলু বলে গেলো আবার-স্যার, আপনার জন্য বড় চিন্তায় আছি।

বললো আরমান—-ভেবো না, আমি সজাগ থাকবো

চলে গেলো মংলু।

আরমান সরাইখানার জানালায় এসে দাঁড়ালো, মুক্ত জানালা দিয়ে তাকালো সে অন্ধকারময় আকাশের দিকে। অসংখ্য তারার মালা, বুটিদার শাড়ির মত লাগছে। হীমেল হাওয়া মুক্ত জানালা দিয়ে আরমানের দেহ স্পর্শ করলো।

শরীরটা বেশ সুস্থ লাগছে! মনটাও সচ্ছ মনে হচ্ছে, বেশ প্রফুল্ল লাগছে আরমানের। মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে একটির পর একটি সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে আরমান। ধীরে ধীরে সে গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেলো, আগামীকাল কাজ সমাধা করে তার ফিরে যাওয়ার কথা। আব্বু তার জন্য পথ চেয়ে থাকবেন।

আরমান কোনোদিন এ পথে আসেনি তার আব্বুও আসেননি। তাই প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন মিঃ নিয়াজী। আরমান বলেছিলো, আব্বু কিছু ভেবো না নতুন জায়গায় নতুন মালের সন্ধান পাবো।

আরমানের কথা শুনে হেসে বলেছিলেন মিঃ আব্বু নিয়াজী, নতুন জায়গায় নতুন মালের সন্ধান পাবে। আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কাঠের ব্যবসা করছি, এমনকি আফ্রিকা জংগলেও যেতে হয়েছিলো আমাকে কাঠের সন্ধানে। আরমান তার পিতার কাছে কত নতুন কাহিনী শুনেছে। কত বিস্ময়কর কাহিনী, কত ভয়ংকর কাহিনী–এ সব শুনে আরমানের কাছে রূপকথার কাহিনীর মত মনে হয়েছে। কত বার তার আব্বু হিংস্র জীবজন্তুর কবলে পড়েছেন, কত আশ্চর্য জন্তুর সাক্ষাৎলাত ঘটেছে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কাঠের ব্যবসায় তার অভিজ্ঞতাও বেড়েছে লাখখাগুণ।

এহেন পিতার সন্তান আরমান। পিতার একমাত্র সন্তান সে আব্বু নিয়াজী কোটিপতিই শুধু নন, পৃথিবীর নানা দেশে তার কাঠের আড়ত আছে। আছে অনেকগুলো ইন্ডাষ্ট্রি, তাই মিঃ নিয়াজীকে বছরের বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে থাকতে হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র মিঃ নিয়াজীর ইণ্ডাষ্ট্রির সুনাম আছে। বড় বড় জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে আছে তার যোগাযোগ।

বিদেশে রেখে লেখাপড়া করিয়েছেন মিঃ নিয়াজ তার সন্তানকে।

আরমান ফিরে এসেছে মস্ত বড় ডিগ্রি নিয়ে কিন্তু চাকরির জন্য আরমান লেখাপড়া করেনি, করেছে সে জ্ঞান অর্জনের জন্য। মিঃ নিয়াজীও খুশি ছিলেন সন্তানের প্রতি, কারণ চাকরি তিনি নিজেও পছন্দ করতেন না। লেখাপড়া শিখলেই চাকরি করতেই হবে এর কোন যুক্তিসঙ্গত নিয়ম নেই, জ্ঞানার্জন করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

আরমান তাই মস্তবড় ডিগ্রি নিয়েও পিতার ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। নিজেই সে এবার বেরিয়ে পড়েছে কাঠের সন্ধানে।

নতুন স্থানে নতুনভাবে ভালো মালের খোঁজ পাবে এই ভরসা নিয়েই আরমান বেরিয়েছে। যদিও এ পথ তার সম্পূর্ণ অজানা তবু সে কোনো দ্বিধা করেনি।

শুনেছিলো সালিমা ঝিং পর্বতের অদূরে সালিমা জঙ্গলে বহু পুরোন গাছ আছে, যে সব গাছের বয়স হাজার বছরেও বেশি হবে। এই সব কাঠের মূল্য অন্যান্য কাঠের চেয়ে, তিন গুণ কারণ এ সব কাঠ দিয়েই জাহাজের কাঠামো তৈরি হয়, লোহার মতই শক্ত এবং কঠিন এ সব কাঠ। নোনা পানি এসব কাঠের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

আরমান গাড়ি নিজেই চালিয়ে নিয়ে এসেছে। ড্রাইভার গাড়ি চালাক এটা সে পছন্দ করে না। এ অভ্যাস তার আজ নতুন নয়। বিদেশে থাকাকালেই এ অভ্যাস তার হয়েছিলো এবং এখনও আছে।

মিসেস নিয়াজী অনেক সময় এ কারণে রাগ করেন। ড্রাইভার ছাড়া একা কেন সে পথে বের হয়। কেন সে নিজে ড্রাইভ করে সব জায়গায় যায়। কিসের অভাব তার?

এসব শুনে হাসে আরমান, মা কি এখনও তাকে ছোট্ট শিশু মনে করেন। তাই এত সাবধানতা তার! আপন মনে হাসে আরমান।

সত্যিই মায়ের মন সন্তানের প্রতি সদা দুর্বল। না জানি কখন কোন্ বিপদ ঘটিয়ে বসবে কে জানে। হঠাৎ কোনো কিছু না হয় এই চিন্তা সর্বদা ভাবিয়ে তোলে তাকে।

আরমান এবার ফিরে এলো শয্যার পাশে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো, রাত এখন এগারোটা বেজে গেছে।

হাই তোলে আরমান।

রাত বাড়ছে, তার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। গভীর এক রহস্য সরাইখানার বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে তার ধমনির রক্তে শিহরণ জাগাচ্ছে।

অর্ধশায়িত অবস্থায় আরমান শুয়ে পড়লো।

সরাইখানার ছাদে তাকালো সে।

এই রাতটা তাকে যেমন করে তোক জেগে কাটাতে হবে। নিজের হাতখানা তুলে ধরলো আরমান চোখের সামনে। কজায় লাল ফুটার একটা দাগ। সেই ভয়ালো ছায়ামূর্তিটা তার কজায় ইনজেকশান পুশ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাসলো আরমান আপন মনে, সে যা ভাবছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে নতুন এক আবিষ্কার হবে তার জীবনে!

কি ইনজেকশান তার দেহে পুশ করা হয়েছে? কি তার উদ্দেশ্য? কে সেই ভয়ংকর লোকটা?……নানা ধরনের চিন্তা আরমানকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে আরমান সে নিজেই জানে না। হঠাৎ তার তন্দ্রা ছুটে গেলো। রাশিকৃত ধূয়াকুন্ডলি কক্ষটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আরমানের তন্দ্রা ছুটে গেলেও সে নিশ্চুপ রইলো এবং গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ করতে লাগলো। ক্রমে নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে, তবে কি সত্যি সে আজও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে? না, কিছুতেই সে সংজ্ঞা হারাবে না। যেমন করে হোক সজ্ঞানে থেকে সব লক্ষ করতে হবে। এই সরাইখানার অভ্যন্তরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা উদঘাটন করতেই হবে……কিন্তু একি, মাথাটা কেমন যেন টলছে, ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতরটা, তবে কি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে সে……

হঠাৎ ধূম্রাচ্ছন্ন কক্ষটার মধ্যে একটি ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো। সেই নাকমুখ চোখ, ভীষণ একটা মুখ। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

কি ভয়ংকর একটি ছায়ামূর্তি!

আরমান নিজকে সংযত এবং সজ্ঞান রাখার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো।

ছায়ামূর্তিটা ধুম্ররাশির মধ্যে এগিয়ে আসছে তার দিকে। অতি নিকটে এসে পড়েছে।

আরমানের হাত দুখানা আপনা আপনি মুষ্টিবদ্ধ হলো, অধর দংশন করে আপন মনে বললো, কে তুমি আজ তোমাকে আমি দেখে নেবো! তুমি শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। কি তোমার উদ্দেশ্য……।

একেবারে অতি নিকটে এসে পড়েছে ছায়ামূর্তিটা। আরমান ভালভাবে লক্ষ করে দেখলো আজ তার হাতে সিরিঞ্জ নেই; গত রাতে যে বস্তুটা তার হাতে ছিলো।

আরমান কতকটা নিশ্চিন্ত হলো, কিন্তু নিঃশ্বাস তার বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে।

অতি কষ্টে কঠিনভাবে নিজকে সজাগ রেখেছে আরমান। সে রুমালে নাকটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলো। এমনভাবে নাকটা ধরে রেখেছিলো যেন বোঝা না যায় যে সে নাকটা ধরে রেখেছে।

ছায়ামূর্তি একেবারে খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো। আরমানকে সংজ্ঞাহীন মনে করে সে হাত বাড়ালো। পাশেই দু'জন লোক মুখে মাস্ক পরা, তাদের হাতে মোটা শিকল। আরমান বুঝতে পারলো ভীষণ আকৃতি লোকটা তাকে পাকড়াও করে সঙ্গী দুজনের হাত থেকে শিকল নিয়ে তাকে আটক করবে।

আরমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিজের হাত দুখানা দিয়ে ধরে ফেললো ভীষণ চেহারার ছায়ামূর্তিটাকে!

আরমান ওকে ধরে ফেলতেই সে একচুল নড়তে পারছে না। এত শক্তি আরমানের দেহে কোথা থেকে এলো, কি করে সে ধরে ফেললো শক্তিশালী ছায়ামূর্তিটাকে।

আরমান এবং ছায়ামূর্তি ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দুজন যারা মুখে মাস্ক বাঁধা শিকল হাতে ছিলো তারা পেছন থেকে আরমানকে ধরে ফেললো।

কিন্তু আরমান এক ঝাঁকুনিতে তাদের সরিয়ে দিলো।

ধূম্রুরাশির মধ্যে ওরা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। এবার ওরা মরিয়া হয়ে উঠলো ছায়ামূর্তিটাকে আরমানের হাত থেকে মুক্ত করে নেবার জন্য।

ছায়ামূর্তি পাকড়াও করতে এসে নিজেই সে ধরা পড়ে গেলো। এটা কিছুতেই ওরা মেনে নিতে পারে না। আবার মাস্ক পরা লোক দু'জন ছায়ামূর্তিকে মুক্ত করার জন্য আরমানের গলায় শিকল পরিয়ে টেনে আনার চেষ্টা করলো।

আরমান এবার পড়ে গেলো চীৎ হয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানা তার কিছুটা হাল্কা হয়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্তি তার হাতের মুঠা থেকে নিজকে মুক্ত করে নিলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ছায়ামূর্তি সহ লোক দুজন ধুয়াকুন্ডলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আরমান ধূম্রাচ্ছন্ন কক্ষটার মধ্য হতে দ্রুত দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। প্রাণভরে সে সচ্ছ বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো। বুকটা অনেকখানি হাল্কা মনে হচ্ছে এখন। উঃ! কি সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছিলো সে! ভয়ংকর ছায়ামূর্তিটা তাকে শিকলে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত শক্তি কি করে আরমানের দেহে এলো! এত শক্তিমান ছায়ামূর্তিটাকে সে এত সহজে কাবু করে ফেললো। অন্ধকারেই আরমান নিজের হাত দুখানা তুলে ধরে হাতের কজা দেখার চেষ্টা করলো।

আরমান সরাইখানার বাইরে মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো। তারাভরা আকাশ। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করার জন্য হাত দিতেই মনে পড়লো সে তো নাইট ড্রেস পরে বিছানায় শুয়ে ছিলো। কাজেই নাইট ড্রেসের পকেটে সিগারেট কে ছিলো না। কাজেই আপাতত সিগারেট পান থেকে বিরত রইলো আরমান।

একটু পূর্বের সমস্ত ঘটনাটা মন্থন করে চললো সে। কি ভয়ংকর সেই ছায়ামূর্তি, তার সঙ্গীদ্বয় তারাও এক একজন হিংস্র জন্তুর মত ভীষণ। এত ধূম্ররাশিই বা এলো কোথা হতে, তারপর আবির্ভাব ঘটলো সেই ভয়ংকর ছায়ামূর্তি ও তার সঙ্গীদ্বয়ের। প্রথম রাতে সে স্পষ্ট দেখেছে শুধু সেই ছায়ামূর্তি, যাকে সে একটি বড় সিরিঞ্জ হাতে দেখেছিলো, আর আজ তাকে দেখলো সিরিঞ্জ তার হাতে নেই, আছে দুজন সংগী এবং সংগীদ্বয়ের হাতে দুটি শিকল।

শিকল দুটি দিয়ে আরমানকে ওরা আটক করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো এটা সত্য। কিন্তু পারেনি, ভয়ংকর ছায়ামূর্তিটাকেই শুধু আরমান পরাজিত করেনি, পরাজিত করেছে তার সংগীদ্বয়কেও। কারা এরা? কি উদ্দেশ্য এদের? এরা দরজাবদ্ধ সরাইখানায় কি আরমানের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে।

মৃত্যু তার হতেই কিন্তু হয়নি যার পেছনে রয়েছে গভীর কোনো রহস্য। যে রহস্যের শিকার সে নিজে....

স্যার আপনি?

কে মংলু?

হাঁ স্যার, আপনি এতরাতে সরাইখানার বাইরে, স্যার এটা ভাল করেননি।

কেন?

বলেছি তো সব কথা বলতে মানা আছে। কথাগুলো চাপা কণ্ঠে বললো মংলু।

রাতের জমাট অন্ধকারে মংলুকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না। তবু তার কণ্ঠস্বরে মনে হলো সে আরমানের অনেক কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আরমান ভালভাবে মংলুর মুখটা দেখবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। মংলু কি করে জানলো সে এখন সরাইখানার বাইরে। ওর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র নেই তো?

মংলু বললো—স্যার, আপনি কাল সকালে চলে যান। এখানে আপনার বিপদ আছে।

মংলু!

কোনো জবাব নেই।

মংলু তাহলে চলে গেছে। আরমান অন্ধকারে ভাল করে তাকালো। সত্যি মংলু চলে গেছে, কিন্তু কোথায় গেলো। তার শোবার ঘরে নিশ্চয়ই।

আরমান জানে না কোথায় শোয় বা ঘুমায় মংলু। তবু সরাইখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ডাকলো মংলু, মংলু......

কিন্তু কোনো সাড়া এলো না!

আরমান এবার নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো। আশ্চর্য ধুম্ররাশির কিছুমাত্রও এখন অবশিষ্ট নেই। সমস্ত কক্ষটা এখন পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।

আরমান শয্যার দিকে তাকালো, সেখানে কোনো রকম কিছু পরিলক্ষিত হলো না। সেই ভয়ংকর ছায়ামূর্তির সংগে তার প্রচন্ড লড়াই হয়েছে তাতে বিছানাটা এলোমেলো হয়ে পড়েছিলো, সেই অবস্থায়ই আছে।

দুজন এসেছিলো, তাদের হাতে ছিলো শিকল, ওরা চলে যাবার সময় শিকল ফেলে যায়নি। ওরা অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধানী তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু ওরা গেলো কোথায়? দরজা ঠিক তেমনি বন্ধ ছিলো, আরমান নিজে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো। গভীর ধূয়ারাশির মধ্যে তলিয়ে যাবার মতই ওরা তলিয়ে গিয়েছিলো।

আরমান শয্যায় বসে টেবিল থেকে সিগারেট কেসটা তুলে নিলো হাতে। একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর সে তলিয়ে গেলো গভীর চিন্তার অতলে। কি ভয়ংকর মৃত্যু বিভীষিকা থেকে সে রেহাই পেয়েছে……মংলুর মুখে সে যা শুনেছে তাতে এ সরাইখানা থেকে কেউ সুস্থ মানুষ হিসেবে ফিরে যেতে পারেনি, সেও পারতো না। তার সৌভাগ্য বলতে হবে, না হলে তার পরিণতি হয় মৃত্যু নয় মস্তিষ্ক বিকৃতিদুটোর একটি ঘটতেই তার অদৃষ্টে। প্রথমেই আরমানের চোখের সামনে মায়ের মুখ ভেসে উঠলো। পিতামাতার একমাত্র সন্তান আরমান। তার যদি কিছু একটা ঘটে যেতো তাহলে তার আব্বু-আম্মি-কে কেউ বাঁচাতে পারতো না। তাদের বিশাল ঐশ্বর্যের পরিণতি কি হতো তা বলা কঠিন, পিতামাতার দোয়ায় আজ রক্ষা পেয়েছে আরমান।

সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে ওঠে দাঁড়ালো আরমান। এ সরাইখানার গভীর রহস্য তাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে কিন্তু দ্রুত কিছু করাই সম্ভব নয়, ধীরে ধীরে তাকে অগ্রসর হতে হবে। আপাতত সব কথা তাকে চেপে যেতে হবে অতি সাবধানে। এমন কি আব্বু-আম্মির কাছেও বলা সমুচিত হবে না। যেভাবে সে কাজ করে চলেছে তাই করবে আরমান। হাংহা সরাইখানা তার জীবনে এনে দিয়েছে বিরাট এক পরিবর্তন।

কিন্তু আর বিলম্ব করা তার উচিত হবে না হাংহায়। এখানে তার জীবনের বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে। যে রহস্য তাকে নতুন এক জীবন দান করলো।

আরমান দ্রুতহস্তে স্যুটকেস গুছিয়ে নিলো, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দেবে সে। পরে নিলো তার কোট, প্যান্ট, টাই, পরে নিলো জুতো জোড়া।

পুনরায় বিছানায় বসলো আরমান।

এই শয্যা তার জীবনের এক স্মরণীয় শয্যা। এখানে এই শয্যাকৃত ব্যক্তিই না লাশ হিসেবে শায়িত হয়েছে। আরমান সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলে তাকে সালিমা জংগলে যেতে হবে। কাঠের সন্ধান করে এবং কাঠ ক্রয় করে ফিরে যেতে হবে তাকে।

মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো আরমান।

জানালা আজ শিকবিহীন।

যে শিকগুলো আরমান বাঁকা করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো সেগুলো এখনও সরাইখানার জানালার পাশে পড়ে আছে। কেউ সেগুলো সরিয়ে ফেলেনি বা এ নিয়ে তাকে প্রশ্ন করেনি।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট পান করছিলো আরমান। দূরে সালিমা ঝিং পর্বতের চূড়ার পাশ দিয়ে আকাশের কিছু অংশ ফর্সা হয়ে এসেছে। ভোর হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। একটা নতুন উম্মাদনা আরমানের মনকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

এক সময় সালিমা ঝিং পর্বতের চূড়ায় সূর্য উদয় হলো। হাংহা ঝিং সরাইখানায় জেগে উঠলো সরাইখানার কর্মচারিগণ।

সরাইখানার ম্যানেজার হুয়াংকিংকে পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ফিরে এলো আরমান।

সুটকেসটা হাতে তুলে নিতেই মংলুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কানে-স্যার!

আরমান ফিরে তাকাতেই নজর পড়লো মংলুর দিকে, সঙ্গে একজন লোক। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রং তামাটে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছে যেন। পরনে অদ্ভুত ধরনের কাপড়।

আরমান একনজরে মংলুর সঙ্গীটিকে দেখে নিলো। লোকটা মাথাটা আশ্চর্যজনকভাবে নত করে কুর্ণিশ জানালো।

মংলু বললো স্যার, আমার বাবা।

আরমান মনে মনে আশ্চর্য হয়েছিলো কিন্তু সামলে নিলো সে নিজকে, বললো—ও!

মংলুর বাবার চেহারা আরমানের চোখে সম্পূর্ণ আলাদা লাগলো। মংলু আর তার বাবার মধ্যে কোনো মিল নেই।

মংলুর চেহারার মধ্যে রয়েছে একটা স্বাভাবিক ভাবধারা আর তার বাবার চেহারা একেবারে উল্টা। আরমান বললো–মংলু, আমি চলে যাচ্ছি।

মংলু কিছু বলবার পূর্বেই বললো ওর বাবা-স্যার, আপনি বলেছিলেন আরও কয়েক। দিন থেকে যাবেন কিন্তু শুনালাম আজই চলে যাচ্ছেন?

ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো আরমান মংলুর বাবার দিকে। আজ দুদিন দুরাত এই সরাইখানায় কেটে গেলো অথচ একটি মুহূর্তের জন্য মংলুর বাবার সাক্ষালাভ ঘটেনি। মংলু বলেছিলো তার বাবা সরাইখানার বাগানে মালির কাজ করে কিন্তু বাগানে তো দূরের কথা, সরাইখানার অভ্যন্তরেও তাকে নজরে পড়েনি।

মংলু বললো বাপু আপনার চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে ছুটে এলো।

আমি চলে যাবো এ সংবাদ তাকে কে জানালো?

কেন স্যার আমি জানিয়েছি।

তুমি কেমন করে জানলে?

হাসলো মংলু, তারপর বললো–স্যার, আমি এ সরাইখানার বয় আর আমি জানবো না?

তাই নাকি? বললো আরমান।

মংলুর বাবাও হাসলোস্যার এ মুলুকে আমিই সর্দার। সরাইখানাটাও আমার সীমানার মধ্যে। তবে আমি সরাইখানার মালিক নই।

হু। একটু শব্দ আরমানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। বললো আরমান—-যাক, তোমার বাপুর সঙ্গে দেখা হলো বিধায় মুহূর্তে, খুব খুশি হলাম।

আমিও কম খুশি হইনি স্যার, মংলুর মুখে আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি, তাই ছুটে এলাম।

মংলু আবার বাড়ি গিয়ে বলেছে আমার কথা?

হাঁ স্যার। যাক চলেই যখন যাচ্ছেন তবে আবার আসবেন।

নিশ্চয়ই আসবো।

এবার এলে আমার কুটিরে নিয়ে যাবে আপনাকে।

তা আর বলতে হবে না, এলে নিশ্চয়ই যাবো। সর্দার, তোমার নামটা কিন্তু এখনও শোনা হয়নি?

স্যার, আমরা জংলী মানুষ, আমাদের নাম বড় মন্দ, রংলাল।

বাঃ! চমৎকার নাম রংলাল। আচ্ছা মনে থাকবে তোমাদের কথা। চলি এবার।

স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিতেই মংলু বললো—স্যার, আমাকে দিন। আমি গাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।

রংলাল বললো কিছু না খেয়ে যাবেন স্যার?

না, আমি কিছু খাবোনা এখন। বলে পা বাড়ালো আরমান সরাইখানার বাইরের দিকে।

রংলাল আর মংলু তার পেছনে এসে দাঁড়ালো।

মংলু সুটকেসটা তুলে দিলো গাড়ির পেছন আসনে।

আরমান গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

হাত নাড়লো মংলু।

রংলাল তাকিয়ে আছে আরমানের দিকে।

আরমান ঘাড় ফিরিয়ে রংলালকে শেষবারের মত দেখে নিলো।

*

সালিমা বন থেকে কিছু দূরে ভীলদের বস্তি। ভীল সর্দার রঘুনাথ এই বনের মালিক। রঘুনাথের পূর্বপুরুষদের কেউ নাকি এই সালিমা বনটার কিছু অংশ পত্তন করে নিয়েছিলো। সেই থেকে বংশানুক্রমে সালিমা বনের ভোগদখল করে আসছে রঘুনাথের পূর্বপুরুষগণ এবং আজ পর্যন্ত রঘুনাথ নিজেও।

আরমানের গাড়ি পৌঁছতেই রঘুনাথ তাকে অভ্যর্থনা জানালো। বসালো তার উঠানে সমাদর করে।

ডাকলো রঘুনাথ তার একমাত্র কন্যা শিম্মিকে।

শিম্মি চঞ্চল হরিণীর মত ছুটে এলো বাপুজীর ডাক শুনে।

বললো শিম্মি-বাপুজী, আমাকে ডাকছো? কিন্তু আরমানের চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, কতকটা হকচকিয়ে গেলো সে।

রঘুনাথ বললো–শিম্মি, শহর থেকে বাবুজী এসেছেন কাঠ কিনতে। পাখা নিয়ে বাতাস কর। দেখছিস না বাবুর শরীর ঘেমে গেছে।

আচ্ছা বাপুজী। বলে শিশ্মি চলে গেলো কুটিরের ভেতরে।

একটু পরে ফিরে এলো তালপাতার পাখা হাতে, বাতাস করতে শুরু করলো শিম্মি।

আরমান হেসে বললো—-থাক, হাওয়া করতে হবে না। শিম্মি আমাকে দাও পাখাটা……হাত বাড়ালো সে শিম্মির দিকে।

শিম্মি বললো–বাবুজী, হামি বাতাস করলে তোর খুব খারাপ লাগবে?

না, তবে আমাকে দাও।

বাপুজী রাগ হবে।

আরমান তাকালো রঘুনাথের দিকে।

হেসে বললো রঘুনাথ–ওর মা নেই বাবুজী, তাই বড় আদরের। আমি বলি ভাল করে কথা বলতে শেখ্ কিন্তু ও ভাল কথা বলবে না।

বেশ তো কথা বলছে শিম্মি। শোন রঘুনাথ, সব সময় যে যার নিজের ভাষায় কথা বলা ভাল। নিজের ভাষায় কথা বলতে যত তৃপ্তি তত আনন্দ নেই খিচুড়ি ভাষায়।

শিম্মি খিল খিল করে হেসে উঠে বললো–খিচুড়ি ভাষা কাকে বলে বাবুজী?

খিচুড়ি ভাষা হলো নিজের ভাষার পরিবর্তে যখন আমরা বিদেশী ভাষায় অশুদ্ধভাবে কথা বলি বা বলতে চেষ্টা করি। এতে আমাদের ভাষায় সংমিশ্রণ ঘটে। না হয় নিজের ভাষা, না হয় বিদেশী ভাষা, কোনটাই শুদ্ধ হয় না। তাই আমার মনে হয় যার যার নিজের ভাষায় কথা বলা ভাল।

শিম্মি আরমানের কথায় খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো, বললো সেবাপুজী, হামি তোদের মত সুন্দর করে কথা বলি না হামার ভাষা আমার কাছে খুব ভাল লাগে। বাবুজী, তুই বহুৎ ভাল, তাই আমার কথা তুই মেনে নিলি! বাপুজী কিন্তু হামাকে খুব বকে দেয়।

আরমান বললো–রঘুনাথ, তুমি ওকে আর কোনোদিন বকবে না কেমন? চলো এবার বনে যাই-কাঠ দেখতে।

বাবুজী, যখন তখন যাওয়া যাবে না। বনে যেতে হলে যোয়ান লাগবে।

যোয়ান! যোয়ান কারা?

সে তখন দেখবেন বাজী। যোয়ান মানে আমাদের যোয়ান দল আছে। তাদের হাতিয়ার আছে, কোনো ভয়ংকর জীবজন্তু বের হলে এরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। খুব শক্তিশালী এরা বাবুজী।

তাহলে তোমাদের যোয়ানদের কখন পাওয়া যাবে?

হামি ডাক দিলে ওরা সবাই এসে পড়বে বাবুজী।

কখন তাহলে ডাকবে তুমি?

যদি এখন আপনি যেতে রাজি হন……

হাঁ রাজি আছি। তুমি তোমার মোয়ানদের ডাক দাও।

রঘুনাথ শিম্মিকে লক্ষ করে বললো—শিম্মি যা। ডাক দে।

শিম্মি হাতের পাখাটা নামিয়ে রেখে চলে গেলো, একটু পরে একটি সিঙ্গা হাতে বেরিয়ে এলো।

রঘুনাথ বললো—এবার ডাক দে মা।

শিম্মি সিঙ্গায় ফুঁ দিলো।

অদ্ভুত সে শব্দ।

আরমান অবাক হয়ে শিম্মির দিকে তাকিয়ে আছে। শিম্মি সিঙ্গায় ফুঁ দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বস্তির মধ্যে হতে বেরিয়ে আসে একদল বলিষ্ঠ লোক। তাদের চেহারা ভয়ংকর বলা যায়। খাটো এবং মোটা মোটা লোকগুলো। বয়স ওদের ত্রিশের বেশি নয়।

ওদের চেহারাই প্রমাণ করে ওরা ভীষণ শক্তিশালী। এক একটা লোহার থামের মত মজবুত। প্রত্যেকের হাতে এক একটা তীরধনু। কারও বা হাতে বর্শা।

আরমান অবাক হয়ে দেখছিলো।

বললো রঘুনাথ–বাবুজী, এরাই আমাদের যোয়ান।

ও! বললো আরমান।

রঘুনাথ বললো—-চলেন বাবুজী এবার হামরা বনে যাই।

শিম্মি বললে দাঁড়াও বাপুজী, ও, ক কিছু খেতে দিই। দেখছিস না বাবুজীর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে।

আরমান ভাবলো শিম্মি জংলী হলেও তার মধ্যে প্রাণ আছে, বিবেক-বিবেচনা আছে, তার বোধশক্তির তারিফ করতে হয়। সত্যি আরমান বেশ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলো।

শিম্মি ততক্ষণে চলে গেছে।

একটু হেসে বলে রঘুনাথ-বড় পাগলী মেয়ে, আপনি না খেয়ে গেলে ও কেঁদেকেটে অস্থির হবে। বড় জেদী মেয়ে বাবুজী......ঐ এসে গেছে।

শিম্মির হাতে একটা ঝুড়িতে বেশ কিছু ফলমূল। সে কোনো দ্বিধা না করে ফলের ঝুড়িটা আরমানের হাতে দিয়ে বললো—খেয়ে নে বাবুজী!

আরমান একটু হেসে বললো—শিম্মি, অনেক ধন্যবাদ। তারপর সে ফলগুলো থেকে কিছু ফল খেলো।

অনেকটা তৃপ্তি বোধ করলো আরমান এবার।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালো।

যোয়ানদল সহ রঘুনাথ আরমানকে নিয়ে এগিয়ে চললো গভীর বনের মধ্যে।

প্রায় হাজার বছরের পুরোনো গাছ রয়েছে। কতকগুলো তারও বেশি হবে। আরমান অবাক হয়ে গেলো। খুশিতে উচ্ছল হলো সে।

এত সুন্দর গাছ আরমান ইতিপূর্বে দেখেনি। এক একটা গাছের বেষ্টনী প্রায় আট-দশ ফুট। তারও বেশি আছে বহু গাছ আছে যার মাপজোখ পাওয়া মুস্কিল।

আজ আরমান কাঠ দেখতে এসেছে এবং কিছু টাকা বায়না করবে সে।

যে গাছগুলো আরমান পছন্দ করলো সেগুলোতে চিহ্ন করতে লাগলো রঘুনাথ।

যোয়ানরা তাদের চারপাশে রয়েছে।

আরমান গাছ পরীক্ষা করে দেখছিলো সেই মুহূর্তে একটা বিরাট বড় বাঘ বন থেকে বেরিয়ে এলো। আচম্বিতে আক্রমণ করে বসলো যোয়ানদের একজনকে।

অন্য যোয়ানরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং বাঘটার ওপর তীর-বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগলো কিন্তু তীর এবং বর্শা বাঘটার দেহে বিদ্ধ হলেও বাঘটা কাবু হলো না, ভীষণভাবে আক্রমণ চালালো যোয়াটিকে।

যোয়ানদের একজনকে আক্রমণ করলেও সবাই ভীষণ ভড়কে গিয়েছিলো। এমন কি রঘুনাথ পর্যন্ত বিভ্রান্ত পয়ে পড়েছে।

অবশ্য তার বিভ্রান্ত হবার কারণও আছে।

রঘুনাথের একমাত্র সন্তান হীরানাথকে এই বনে বাঘে খেয়েছে। তারপর থেকে রঘুনাথ বাঘকে বড় ডরায়।

শুধু হীরানাথকেই বাঘে খায়নি, রঘুনাথের বংশের অনেককেই সালিমা বন গ্রাস করেছে, তাই রঘুনাথ এত সাহসী হয়েও দুর্বল বাঘের কাছে এবং সেজন্যই রঘুনাথ আজ ভীষণভাবে ভড়কে গেছে।

বাঘটা যোয়ানটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর চেপে বসেছে। এবার সে কামড়ে ধরবে যোয়ানটার গলায়।

আরমান আর স্থির থাকতে পারলো না, সে দৌড়ে গেলো যোয়ান আর বাঘটার দিকে। এবার আরমান বাঘটার গলা জড়িয়ে ধরলো, তারপর টেনে তুলে নিলো সে বাঘটাকে যোয়ানের বুক থেকে।

বাঘে আর আরমানে শুরু হলো লড়াই।

খালি হাত আরমানের।

বাঘটা ভীষণ হা করে আরমানকে আক্রমণ করলো।

আরমান বাঘটার দুচোয়াল দুদিকে টেনে ধরলো এবং অনায়াসে ছিঁড়ে ফেললো। দুপাশে দুচোয়াল স্কুলে পড়লো। বাঘটা কিছুক্ষণ ছটফট করে লুটে পড়লো মাটিতে।

রঘুনাথ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে আরমানকে—বাবুজী, আপনাকে আমি কি দিয়ে খুশি। করবো বাবুজী! আপনি মানুষ না দেবতা…

বললো আরমান—কিছু দিতে হবে না। তা ছাড়া আমি দেবতা নই–মানুষ।

বাবুজী!

এরপর সবাই মিলে বাঘটাকে বেঁধে নিয়ে চলে।

ফিরে এলো আরমানসহ রঘুনাথ দলবল নিয়ে। শিম্মি তো অবাক, বাবুজী বাঘকে হাত দিয়ে ঘায়েল করেছে। শুধু ঘায়েল নয়, হত্যা করেছে। এ সংবাদ বস্তি এলাকায় সবাই শুনলো, শুনে ছুটে এলো বাবুজীকে অভিনন্দন জানাতে।

শিম্মি বললো–বারুজী তুই দেবতা। দেবতা না হলে এমন হয়। কেউ পারে জ্যান্ত বাঘটাকে খালি হাতে খতম করতে। তাও ছোটখাটো বাঘ নয়, একেবারে বাঘের রাজা।

বাঘটার দু পাটি চিবুক ধরে যখন ওর মুখটাকে ফেড়ে ফেলছিলো আরমান তখন বাঘটা তার থাবা দিয়ে আরমানের কাঁধে আঁচড় দেয় এবং সেই আঁচড়ে বেশ খানিকটা ছিঁড়ে যায়। জামাটার কিছু ছিঁড়ে গিয়েছিলো।

এখনও রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষত দিয়ে।

শিম্মি বললো–বাবুজী, তোর জামা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত ঝরছে, আয় বাবুজী, ওষুধ লাগিয়ে দেই।

রঘুনাথ বললো—-হাঁ মা, বাবুজীর রক্ত বন্ধ করতে হবে। ওষুধ নিয়ে আয়।

শিম্মি ছুটে গেলো এবং এক বাটি ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো।

আরমান জামাটা খুলে ফেললো।

সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ শরীর রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। শিম্মি নিজের আঁচলটা মাজা থেকে খুলে নিয়ে ওর শরীরের রক্ত মুছে দিলো, তারপর বললো–বাপুজী, তুই ওষুধ লাগিয়ে দে।

রঘুনাথ যত্ন সহকারে ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে বললো—-বাবুজী, কালকেই ঘা শুকিয়ে যাবে।

আরমান জামাটা পরে নিতে নিতে বললো—ঠিক আছে।

তারপর বিদায় গ্রহণের পালা।

শিম্মি বললো–বাবুজী, আবার আসবি না?

হাঁ আসবো। কাঠ কিনতে আসবো…

গাড়িতে বসলো আরমান।

রঘুনাথ ও শিম্মি হাত নাড়তে লাগলো।

শিম্মি কিছু ফল দিয়েছিলো গাড়ির মধ্যে আরমানের অলক্ষ্যে। ফলগুলো ধরা পড়লো গাড়ির সাইড আয়নায়। হাসলো আরমান।

পথে আবার সেই সরাইখানা।

এটাই বিশ্রামকেন্দ্র বা বিশ্রামাস্থল। এখানে না এসে উপায় নেই।

সরাইখানায় গাড়ি এসে থামতেই ছুটে এলো মংলু।

স্যার আপনি এসেছেন? খুব খুশি লাগছে।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য আসিনি মংলু।

হঠাৎ মংলুর বাবা রংলালের কণ্ঠস্বরস্যার, আজ রাতটা থেকে যান।

না, থাকা সম্ভব নয়, আজই ফিরে যাবো।

কিন্তু পথে কোনো বিপদ হতে পারে স্যার বললো রংলাল।

মংলু আর রংলাল আরমানকে সঙ্গে করে সরাইখানায় প্রবেশ করলো।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার রওয়ানা দিলো আরমান।

রংলাল বা মংলু কারও কথাই সে রাখলো না। আজ আরমানের বারবার মনে পড়ছে তার আব্বু আর আম্মুর কথা। কত দুশ্চিন্তায় আছেন তারা। তিনদিন তিন রাত তার কেটে গেলো!

নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় আছেন তারা।

বলেছিলো আম্মু বাবা আরমান, যেখানেই যাবি সংবাদ পাঠাবি-কেমন আছিস, কবে ফিরবি, বুঝলি?

আরমান হেসে বলেছিলো—-আচ্ছা আম্মি, তুমি কিছু ভেবো না। ঠিক সংবাদ পেয়ে যাবে। কিন্তু আজ কয়েক দিন হয়ে গেলো কোনো সংবাদই বাড়িতে পাঠাতে পারিনি আরমান। আর পাঠাবেই বা কি করে, যেখানে সে গেছে সেখানে কোনো তারবার্তার ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো ডাকঘর।

আরমান ড্রাইভ করে চলেছে।

নির্জন পথ।

চারদিকে শুধু প্রান্তর আর সীমাহীন বালুরাশি। মাঝে মাঝে ঝোঁপঝাড় টিলা।

পথ সমতল না হলেও একেবারে এবড়ো থেবড়ো নয়। গাড়ি চালাতে তেমন কোনো কষ্ট হচ্ছে না আরমানের।

তবে একেবারে নির্জন বলে একটু খারাপ লাগছিলো। এ পথে তো তেমন কেউ আসা যাওয়া করে না।

হঠাৎ দু'চারজনকে পথ চলতে দেখা যায়।

তারা হলো জংলীদল।

শিকারের খোঁজে তারা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে। হাতে তীরধনু অথবা বর্শা নিয়ে। এ প্রান্তরে এক জাতীয় জীব দেখা যায়, সেগুলো খরগোশ বা কাঠবিড়ালীর মত। এরা বালুকারাশির মধ্যে গর্ত করে লুকিয়ে থাকে।

শিকারীরা তাই বালুকারাশির মধ্যে বর্শার খোঁচা মেরে মেরে পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। হঠাৎ মানুষের আগমন উপলব্ধি করে এরা পালাতে চেষ্টা করলে

তীর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলে, তারপর আগুনে পুড়িয়ে খায়।

শুনেছে আরমান এই জীবগুলোর মাংস খেতে এরা খুব পছন্দ করে, কারণ এগুলোর মাংস অত্যন্ত চর্বিযুক্ত।

আরমানের মনে এলোমেলো অনেক চিন্তাই ঘুরপাক খেলেও সব চিন্তা ছাপিয়ে একটি চিন্তা তার মনকে উদ্দীপ্ত করে তুলছিলো তা হলো তার নতুন জীবন লাভ। হাংহা ঝিং সরাইখানায় সেই রাতে সে ধূমরাশির মধ্যে যে ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়েছিলো তা শুধু বিস্ময়কর নয়, অদ্ভুত। গভীর এক রহস্যজাল বিস্তার করে আছে হাংহা ঝিং সরাইখানার অভ্যন্তরে। এ রহস্য তাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে... আবার আসবে সে, আসতেই হবে...

শহরে পৌঁছতে তার বেশ রাত হলো।

গাড়ি ফটক পেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ছুটে এলেন মিঃ নিয়াজী ও তার স্ত্রী মিসেস নিয়াজী।

সন্তানকে দেখে তাদের চোখেমুখে আনন্দোচ্ছাস ঝরে পড়লো, তারা এগিয়ে এলেন।

গাড়ি থেকে হাস্যোজ্জ্বল মুখে নেমে এলো আরমান।

কিন্তু জামা ও কোটের অবস্থা দেখে বলে উঠলেন মিসেস নিয়াজী–একি হয়েছে। আরমান!

মিঃ নিয়াজীও বললেন–কি হয়েছিলো তোমার?

আরমান একটু হেসে বললো–কিছু না আব্বু।

কিছু না বললেই হলো! নিশ্চয়ই কোনো বিপদ আপদ হয়েছিলো। বললেন মিসেস নিয়াজী।

না আম্মি না। তোমরা মিছামিছি ভাবছো, কিছু হয়নি। এই তত সুস্থ দেহে ফিরে এসেছি। আব্বু, তোমার সংবাদ ভালো।

মানে? বললেন মিঃ নিয়াজী।

এগুতে এগুতে বললো আরমান কাঠ সংগ্রহ ব্যাপারে শুভ সংবাদ আছে। আব্বু, তুমি শুনে খুব খুশি হবে।

মিসেস নিয়াজী বললেন-বাবা, তুই ফিরে এসেছিস তাই আমি খোদার কাছে শুকরিয়া করছি। জানিস আমার মন বলছিলো তুই বিপদে পড়েছিস!

মার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আরমান থমকে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললো সে–বিপদ এসেছিলো আমি কিন্তু বিপদ আমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি বরং আমার জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

কথা বলতে বলতে পিতা, মাতা, সন্তান হলঘরে এসে পৌঁছে গেলো।

মিসেস নিয়াজী সন্তানের পাশে বসে তার মাথায়-পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন– কি জানি এবার আমার মনটা বড় অস্থির লাগছিলো। তুই যখন বিদেশে ছিলি তখনও তো এমন লাগেনি। সত্যি করে বল বাবা তোর কি হয়েছিলো?

মিঃ নিয়াজী বললেন–আরমান, তোমার মা বড় উতলা হয়ে পড়েছিলো। সত্যিই তুমি কি কোনো বিপদগ্রস্ত হয়েছিলে?

হাঁ আব্বু, আম্মির চিন্তা সত্যি।

বলো কি আরমান!

একটা বিপদ এসেছিলো তা বেশি কিছু নয়। অমন বিপদ এসেই থাকে আর বিপদকে জয় করাই হলো মানুষের কাজ।

কি বিপদে পড়েছিলে তুমি আরমান উল্কণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মিঃ নিয়াজী।

আরমান বললোকাঠ দেখতে সালিমা বনে প্রবেশ করলাম, সঙ্গে ছিলো একজন জংলী সর্দার। নাম তার রঘুনাথ। রঘুনাথ ও তার যোয়ানরা প্রায়-বাইশ জন। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিলো তীর ধনু আর বর্শা। আমি গাছগুলো পরীক্ষা করে দেখছি এবং দেখতে দেখতে গভীর জংগলে প্রবেশ করেছি, এরাও আমার সঙ্গে আছে। এমন সময় হঠাৎ একটা বিরাট বাঘ আক্রমণ করে বসলো একজন জংলী যোয়ানকে।

বলিস কি বাবা! দুচোখে ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকালেন মিসেস নিয়াজী সন্তানের মুখের দিকে! আরমানের মুখমন্ডলে একটা দীপ্ত বলিষ্ঠতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

বললো আরমান–হা আম্মি, যোয়ানটাকে এমনভাবে বাঘটা আক্রমণ করলো যে, তার মৃত্যু অনিবার্য। তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাঘটা গলায় কামড়ে ধরতে গেলো। ঐ মুহূর্তে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না, বাঘটাকে আমি আক্রমণ করলাম।

তুই–তুই বাঘটাকে আক্রমণ করলি!

হাঁ আম্মি তা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না।

তারপর?

তখন ধস্তাধস্তির সময় একটু মানে বাঘটার নখের একটু আঁচড়ে আমার ঘাড়ের চামড়া কিছুটা ছিঁড়ে গিয়ে ক্ষত হয়েছিলো।

তারপর? তারপর?

আমি বাঘটাকে আমি হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি।

এবার নিয়াজী সাহেব বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তিনি থ' হয়ে গেছেন একেবারে, বললেন-বাঘটাকে তুমি হত্যা করেছে।

হ আব্বু

কি দিয়ে তুমি বাঘটাকে হত্যা করলে? রিভলভারটাও তো সঙ্গে নিয়ে যাওনি?

অস্ত্র দিয়ে নয় আব্বু, হাত…এই হাত দিয়েই আমি বাঘটাকে হত্যা করেছি।

আরমান! মিসেস নিয়াজী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন।

নিয়াজী সাহেবের চোখ দুটোও বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন–তুমি হাত দিয়েই বাঘটাকে হত্যা করেছে আরমান। করতে পারলে?

হাঁ আব্বু।

বিশ্বাস হচ্ছে না আরমান। তুমি আমাদের কাছে এমন কিছু গোপন করছো যা বলতে তুমি চাও না। হয়তো অন্য কোনো বিপদ আপদ এসেছিলো।

না আব্বু, সত্যি বলছি বাঘের আক্রমণ থেকে জংলী যোয়ানটাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি একটু ঘায়েল হয়েছি এই যা।

সন্তানের কথায় সান্ত্বনা পেলেন না মিসেস নিয়াজী এবং মিঃ নিয়াজী। তারা ভীষণ এক উৎকণ্ঠায় মুষড়ে পড়লেন। এসব কি বলছে তাদের ছেলে! সত্য কি সে একটা জীবন্ত বাঘকে হত্যা করেছে শুধু হাত দিয়ে?

আরমান পিতামাতার মনোভাব বুঝতে পারলো, অনুধাবন করলো সে অন্তর দিয়ে। বললো—আব্বু তোমাকে আর যেতে হবে না, আমি নিজেই সালিমা বন থেকে কাঠ আনবো যে কাঠ তোমার আড়তের সবচেয়ে সেরা কাঠ হবে।

সন্তানের কথায় মিঃ নিয়াজী এবং মিসেস নিয়াজী সান্তনা খুঁজে পেলেন না, বরং তারা আশঙ্কিত হলেন। আবার সালিমা বনে যাবে আরমান। লোকমুখে শুনেছেন তারা সালিমা বন হিরোমা শহর ছেড়ে অনেক অনেক দূরে। বিরাট প্রান্তর পেরিয়ে সেই সালিমা বন, যেখানে গেলে সহজে কেউ ফিরে আসতে পারে না।

প্রান্তরে বেদুঈন দস্যুর ভয় রয়েছে।

ভয় রয়েছে হিংস্র জীবজন্তুর।

এছাড়া প্রান্তর পেরুতে গেলে কোনো লোকালয় নেই, কাজেই নানা বিপদ ওঁৎ পেতে থাকে সেখানে। মিঃ নিয়াজী সন্তানকে এসব কারণে সালিমা বনে কাঠ দেখতে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

আরমান হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো–আব্বুর কথাটা। সে সত্যিই গাড়ি নিয়ে সেই সুদূর বনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলো।

বললো আরমান—তোমরা কিছু ভেবো না। এখন আমি বড় হয়েছি, সব বুঝতে শিখেছি। শুধু তোমাদের দোয়া চাই। চলো দেখি কিছু খেতে দেবে আম্মি।

আরে হ্যাঁ, এতক্ষণ ওসব ভুলেই বসে আছি। নাসির, কামাল, ফালু তোরা কোথায়? তোদের ছোট সাহেব এসেছে দেখে যা!

ছুটে এলো নাসির বাবুর্চি, হাতে তার চা নাস্তার ট্রে, তার ওপরে রয়েছে স্তূপাকার নাস্তা।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো পুরোন চাকর কামাল, হাতে তার রাশিকৃত ফলমূল।

ফালু ছোকরা চাকর, সে একগাছা ফুল নিয়ে এসেছে।

বাবুর্চি নাসির আলী বলে উঠলো—আমরা ছোট সাহেবকে দেখেছি বেগম সাহেবা, তাই তো তাড়াহুড়া করে এসব তৈরি করে নিয়ে এলাম।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—বেগম সাহেবা, আমরা সবাই ছোট সাহেবকে দেখেছি।

বললো ফালু-ছোট সাহেব আজ আসবেন আমি জানতাম তাই তো এত ফুল তুলে রেখেছি। ছোট সাহেব ফুল ভালবাসেন তাই...

হেসে বললো আরমান—আম্মি তোমার মতই সজাগ ওরা সবাই, বুঝলে? দাও খাবার খেয়ে নিই। আরমান বাবুর্চির হাত থেকে চা নাস্তার ট্রে নিয়ে টেবিলে রাখলো, তারপর গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

মিসেস নিয়াজীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছে, সন্তান ভালভাবে ফিরে এসেছে, এটা তার চরম খুশির কথা।

মিঃ নিয়াজী বললেন–তুমি বিশ্রাম করো আরমান। আমি ডাক্তারকে ফোনে জানিয়েছি তিনি যেন এক্ষুণি আসেন।

আব্বু, কোনো দরকার নেই ডাক্তারের, জংলী সর্দারের মেয়ে আমার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে। এখন একটুও ব্যথা নেই।

মিঃ নিয়াজী সন্তানের কোনো কথাই শুনলেন না, তিনি ডাক্তার ডাকলেন এবং আরমানের ক্ষত ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে গভীরভাবে আলাপ আলোচনা করলেন।

ডাক্তার ওষুধপত্র দিলেন এবং ভালভাবে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে বললেন–আশ্চর্য, আপনার ছেলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ জানাই আমি আরমানকে......কথাগুলো বলে হাসলেন ডাক্তার।

*

কয়েকদিনের মধ্যেই আরমান সুস্থ হয়ে উঠলো। মন তার ছটফট করছে সেই অজানা অচেনা সালিমা বনের জন্য। একটা অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আরমান নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো সরাইখানার কথা, মংলুর কথা। সেই ভীষণ ধূম্ররাশির মধ্যে ভয়ংকর একটা মুখ, সব তার মনের পর্দায় ভেসে উঠছিলো। পরদিন আবার সেই ধূম্ররাশি, সেই ভয়ংকর মুখ; সঙ্গে শিকল হাতে দুটি বলিষ্ঠ মানুষ। তাদের মুখেও মুখোস। প্রথম দিন ভয়ংকর মূর্তিটার হাতে যে সিরিঞ্জ ছিলো, পরদিন ছিলো না সে লক্ষ্য করেছে। সিরিঞ্জে সেদিন কি ওষুধ ভরা ছিলো যা তার দেহে পুশ করা হয়েছে?

আরমান শয্যায় শুয়ে থাকতে পারলো না, সে শয্যা ত্যাগ করে উঠে এলো বারান্দায়, বেলকুনির ধারে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো দুজন লোক বাড়ির লোহার গেট খুলে প্রবেশ করলো।

এরা কারা, অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

আরমান দেখলো লোক দুজন এগিয়ে আসছে।

এমন সময় দারোয়ানের কণ্ঠস্বর–কোন্ হ্যায়?

সঙ্গে সঙ্গে লোক দু’জন অন্তর্ধান হলো, গা ঢাকা দিলো ঝাউ গাছের আড়ালে।

আরমান সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

গেটের দিকে দৌড়ে গেলো।

কিন্তু কোথাও ঐ দুজনকে দেখতে পেলো না।

ওপাশে একটি ছোট গেট ছিলো, লোহার দরজায় তালো লাগানো ছিলো ভালভাবে।

আরমান বুঝতে পারলো লোক দুজন ঐ দরজার বাইরে প্রাচীন ডিংগিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে আরমান ঐ মজবুত লোহার দরজা আলগোছে খুলে ফেললো।

পেছনে দাঁড়িয়েছিলো দারোয়ান, সে তো অবাক, ছোট সাহেব এত সহজে কি করে লোহার মজবুত গেটখানা খুলে ফেললো! তালাবদ্ধ ছিলো গেটে।

আরমান গেটের ওপাশে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তুলোক দুজন ততক্ষণে কোন্ দিকে চলে গেছে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া গেলো না।

ফিরে এলো আরমান নিজের ঘরে।

দারোয়ান গেলো বেগম সাহেবার ঘরের দিকে। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় মনের কথা ব্যক্ত করতে পারলো না সে। কি বিস্ময়কর ব্যাপার, লোহার দরজা কঠিন তালা সহ কি করে ভেঙে ফেললেন ছোট সাহেব।

সমস্ত রাত সে ঘুমাতে পারলো না।

কখন ভোর হবে তখন সে জানাবে এই বিস্ময়কর সংবাদ বেগম সাহেবাকে।

আরমান নিজ কক্ষে ফিরে এসে শয়ন করলো বটে কিন্তু তারও চোখে ঘুম নেই...কে এরা দুজন? আবছা অন্ধকার হলেও আরমান বেশ বুঝতে পেরেছে ঐ দুই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সেই সরাইখানার ছায়ামূর্তি, যার মুখাকৃতি অতি ভয়ংকর। যার হাতে সে প্রথম রাতে অদ্ভুত ধরনের সিরিঞ্জ দেখেছিলো। তবে কি হাংহা সরাইখানার সেই রহস্য তার পেছনে পেছনে ধাওয়া করছে......কি তাদের উদ্দেশ্য। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে আরমান।

মিসেস নিয়াজী সবেমাত্র ফজরের নামাজ শেষ করে তসবি-তেলাওয়াৎ করছেন এমন সময় দারোয়ান নজর আলী এসে দাঁড়ালো দরজায়।

মিসেস নিয়াজীকে তসবি-তেলাওয়াৎ করতে দেখে সরে গেলো সে আড়ালে।

নজর আলীকে সরে যেতে দেখে মিসেস নিয়াজীর মনটা একটু হকচকিয়ে গেলো, কারণ দারোয়ান নজর আলী কোনোদিন ওপরতলায় বড় একটা আসে না। আজ সে এত সকাল সকাল একেবারে ওপরতলায়, ব্যাপার কি?

মিসেস নিয়াজী তাড়াতাড়ি তেলাওয়াৎ শেষ করে বেরিয়ে এলেন।

দারোয়ান এসে দাঁড়ালো–সালাম বেগম সাহেবা।

বলো কি সংবাদ? বললেন বেগম সাহেবা।

দারোয়ানের দুচোখে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ছে। এসে দাঁড়ালো সে মিসেস নিয়াজীর পাশে, বললো–বেগম সাহেবা রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন শুধু আমি টুলটার ওপরে বসে ছিলাম। এমন সময় গেটের চাবি খুলে দুজন ভয়ংকর চেহারার লোক প্রবেশ। করলো।

আর তুমি নিশ্চুপ দেখলে?

না বেগম সাহেবা, আমি চুপ করে ছিলাম না। ভয়ে লুকিয়ে পড়েছিলাম।

বলো কি, চোর-বদমাইস গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো আর তুমি লুকিয়ে পড়লে চোর-বদমাইসদের দেখে?

বেগম সাহেবা, সেকি ভীষণ চেহারা। চোর-বদমাইস তারা নয়।

তবে কারা?

ভূত! আমার মনে হলো তারা ভূত।

ভূত!

হাঁ বেগম সাহেবা। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলাম-সে এক ভয়ংকর মুখ।

তারপর?

লোক দুজন এগিয়ে আসতেই ঘোট সাহেব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। লোক দুজন হঠাৎ ওদিকের প্রাচীর টপকে বেরিয়ে গেলো। ছোট সাহেব তাদের লক্ষ করে ছুটে গেলেন......তারপর তিনি ওপাশে ছোট গেটের লোহার গেট তালা সহ ভেঙে ফেললেন......বেগম সাহেবা, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছিলাম.....ছোট সাহেব অতি সহজেই তালাসমেত গেট ভেঙে বাইরে বেরিয়ে গেলেন কিছু পরে ফিরে এলেন কিন্তু লোক। দুজন তার পূর্বেই উধাও হয়েছে। বেগম সাহেবা, ছোট সাহেব শুধু হাতে কি করে মজবুত তালাসহ লোহার গেট ভেঙে ফেললেন বড় আশ্চর্য কথা!

কি জানি আমি নিজেও ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু লোক দুজন কারা আর কেনই বা এসেছিলো তারা? কি তাদের উদ্দেশ্য?

বেগম সাহেবা, আমি নিজেও ভেবে পাচ্ছি না। তারা স্বাভাবিক মানুষ না। তারা ভূত ছাড়া আর কিছু না বেগম সাহেবা। আমি মিথ্যা বলছি না। আপনি ছোট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন।

তুমিও যাও, আমি যা শোনার শুনবো।

দারোয়ান চলে গেলো।

মিসেস নিয়াজী ভাবতে লাগলেন, আরমান একটি জীবন্ত বাঘকে শুধু হাতে হত্যা করেছে, তারপর দারোয়ান যা বললো তা ভীষণ আশ্চর্য। সত্যি সে লোহার গেটটা তালাবদ্ধ অবস্থায় ভেঙে ফেলেছে? ......কারা এসেছিলো এবং তারা কি মতলব নিয়ে এসেছিলো? কি জানি সব কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। আরমান কোন্ কুলক্ষণে কাঠ দেখতে সালিমা বনে গেলো, তারপর থেকেই যেন কেমন সব ঘোলাটে লাগছে। একমাত্র সন্তান আরমান, তার কোনো অমঙ্গল হবে না তো? এসব কথা ভাবতে ভাবতে মিঃ নিয়াজীর পাশে এসে বসলেন।

মিঃ নিয়াজী সংবাদপত্রে দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছেন। স্ত্রীকে পাশে বসতে দেখে তিনি চশমার ফাঁকে তাকিয়ে বললেন ব্যাপার কি, কিছু বলবে?

ওগো শুনেছো, দারোয়ান একটা অবাক কথা বললো।

কি বললো?

তুমি তো আছে শুধু তোমার কাঠের ব্যবসা নিয়ে, রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ব্যবসার স্বপ্ন দেখো। বলি সব সংবাদ রাখো?

বাসার সংবাদ রাখবে তুমি আর আমি সংবাদ রাখবো ব্যবসা বাণিজ্যের।

টাকা–শুধু টাকাই তোমার সব!

টাকা ছাড়া মানুষ চলতে পারে? যেদিকে তাকাও শুধু টাকার খেলা।

যেমন তুমি খেলছো?

মিথ্যা নয়।

শোন, আজ দুজন লোক নাকি ফটক পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিলো।

মানুষ প্রবেশ করবে না তো কি পশু প্রবেশ করবে? তা কেমন মানুষ?

মানুষ হলেও তারা নাকি ভূতের মত।

ভূত!

হাঁ গো হাঁ।

সে কি রকম?

বললাম তো রাতদুপুরে যারা বদ্ধ ফটক পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে তারা সাধারণ মানুষ নয়। হয় চোর-ডাকাত নয় ভূতপ্রেত, বুঝলে?

তুমি ভূতপ্রেত বিশ্বাস করো আরমানের মা?

করি না কিন্তু নজর আলী যা বললো তাতে তারা ভূত ছাড়া কিছুই না। আর শোন, আমাদের আরমানের কথা। নজর আলী বললো, ভূত দুটো পেছন ফটকের প্রাচীর পেরিয়ে বেরিয়ে গেলো আর আরমান সেই পেছন প্রাচীরে লোহার গেট তালা সহ ভেঙে বেরিয়ে গেলো বাইরে....

এবার মিঃ নিয়াজী সংবাদপত্রটা রেখে দিলেন পাশে, তারপর বিস্ময়ভরা চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন-আরমান তালাবদ্ধ লোহার গেটটা ভেঙে বেরিয়ে গেলো?

হাঁ, নজর আলী তাই বললো।

আশ্চর্য যদি কথাটা সত্য হয়। সেদিন আরমান বলছিলো সে খালি হাতে একটা বিরাট বাঘকে হত্যা করেছে......কেমন যেন আজগুবি লাগলো কথাটা আমার কাছে।

আমিও বেশ অবাক হয়েছি শুনে আজ যখন দারোয়ান নজর আলী কথাটা বলছিলো তখন......

কি বলছিলো নজর আলী? কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করে আরমান।

মিঃ নিয়াজী এবং মিসেস নিয়াজী একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। কারণ তারা সন্তানকে নিয়েই যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন সেটা তারা সন্তানকে জানাতে চান না।

মিসেস নিয়াজী বললেন–কাল রাতে দুজন ডাকাত এসেছিলো।

ও, রাত দুপুরের সেই ঘটনা। আমি সে কথাই বলতে এলাম কিন্তু নজর আলী সব কথা বলেছে দেখছি।

মিঃ নিয়াজী বললেন-বড় অবাক লাগছে, দারোয়ান পাহারারত থাকাকালীন কি করে ফটক পেরিয়ে চোর বা ডাকাত প্রবেশ করলো।

আমি নিজেও কম অবাক হইনি আব্বু।

এরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলো? বললেন মিঃ নিয়াজী।

আরমান বললো—নিশ্চয়ই কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা আসেনি।

তা তো সত্য, কিন্তু......যেই আসুক তারা সন্ধান না নিয়ে আসেনি। ফটক পেরুলেই যে অন্তপুরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে তা কখনই পারবে না, তবু সাহস করে এসেছিলো কারা তারা?

আরমানও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলো, যারা গত রাতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসেছিলো তারা কি ঐ ব্যক্তি যে তাকে সালিমা ঝিংয়ের হাংহা ঝিং সরাইখানার রাশির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলো?

*

আরমান সালিমা বন থেকে ফিরে আসার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। তার ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেছে, এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

বহুদিন পর মিঃ নিয়াজীর পুরোনা বন্ধু মিঃ ইব্রাহীম কোরেশী এসে হাজির হলেন। বন্ধুকে পেয়ে বন্ধুর আনন্দের সীমা রইলো না। বুকে জড়িয়ে ধরে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন মিঃ নিয়াজী।

রাজ প্রাসাদময় অট্টালিকা মিঃ নিয়াজীর।

চারদিকে ঐশ্বর্যের পাহাড়।

মূল্যবান আসবাবপত্রে ভরপুর মিঃ নিয়াজীর সংসার। যেদিকে তাকানো যায় আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান। মূল্যবান কার্পেটে আচ্ছাদিত মার্বেল পাথরে তৈরি মেঝে। দেয়ালে মনিষীদের তৈলচিত্র। বেলোয়ারী ঝাড় ঝুলছে। ত্রিপয়ায় ব্রোঞ্জের টব। কক্ষের একপাশে ধবল প্রস্তরমূর্তি।

মিঃ এবং মিসেস নিয়াজীর রুচি আছে বলা যায়।

একমাত্র সন্তান আরমান তাদের গর্ব। এমন ছেলে বড় দেখা যায় না।

মিঃ নিয়াজীর আত্নীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বলেন, বড় ভাগ্যবান নিয়াজী সাহেব, না হলে এমন সন্তান ক জনার ভাগ্যে জন্মে। রূপে-গুণে শিক্ষা-দীক্ষায় আরমান অনন্য। যেমন বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারা, তেমনি স্বভাব-চরিত্র। তেমনি তার কণ্ঠস্বর।

যে কোন স্বনামধন্য ব্যক্তির কন্যা সমর্পণ করার জন্য এমন একটি ছেলে একান্ত কাম্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ ইব্রাহীম কোরেশীর হঠাৎ আগমনে মিঃ নিয়াজী বিস্ময় প্রকাশ না করলেও কিছুটা অবাক হয়েছিলেন মনে মনে, কারণ অধ্যাপনাকালে একসঙ্গে মেলামেশার

সুযোগ এসেছিলো। তারপর বহুদিন সাক্ষালাভ ঘটেনি উভয়ের। অবশ্য মিঃ নিয়াজী নিজের ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, তিনি কারও সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেতেন না। এমন কি ঘনিষ্ঠ আত্নীয়-স্বজনের সঙ্গেও তিনি সামাজিক অনুষ্ঠানে একত্রিত হবার সুযোগ করে উঠতে পারতেন না।

মিসেস নিয়াজী এ কারণে স্বামীর প্রতি একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার সখ ছিলো স্বামীসহ আত্নীয়স্বজনের বাসায় যাবেন এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিছু সময় কাটাবেন। এ ছাড়াও নিজের ভাই-বোন এদের কাছে কে না যেতে চায়।

অগত্যা মিসেস নিয়াজী একাই যেতেন তবে খুব কম। যেখানে না গেলেই নয় সেখানে তিনি সময় করে একটু-আধটু যেতেন বা যেতে চেষ্টা করতেন। কন্যাসন্তান তাদের ছিলো না, আরমান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সন্তানও তাদের ছিলো না। কাজেই সঙ্গী ছিলো না বলেই কোনো আমন্ত্রণ তিনি সহজে গ্রহণ করতেন না।

বহুদিন পর পুরানো বন্ধুকে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হলেন মিঃ নিয়াজী এবং মিসেস নিয়াজী।

তারা অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন মিঃ ইব্রাহীমকে।

মিঃ নিয়াজী পাশে বসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

মিঃ ইব্রাহীম কুশলাদি বিনিময়ের পর হেসে বললেন-যে কারণে আমি এসেছি এবার সেই কথাটা পাড়তে চাই। আশা করি বিমুখ হবো না।

মিঃ নিয়াজী একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বন্ধু ইব্রাহীমকে বললেন–কি কথা বলুন মিঃ ইব্রাহীম

উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব থাকলেও তারা ছোটবেলার সাথী নন। শিক্ষার শেষ পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মেছে, তাই তারা উভয়ে উভয়কে আপনি বলেই সম্বোধন করেন।

বললেন মিঃ ইব্রাহীম–ভূমিকার কোনো দরকার মনে করছি না, কারণ আমরা উভয় পক্ষই উভয়ের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। মিঃ নিয়াজ, আমার কনিষ্ঠা কন্যা ইরার জন্য আপনার সন্তান আরমানকে চাই।

মিসেস নিয়াজ হাসিমুখে বলে উঠলেন–আপনার কন্যা ইরাকে আমি ভালভাবে জানি এবং দেখেছি। ভারী সুন্দর–যেমন ব্যবহার তেমনি রূপসী......

হাঁ, এ কথা মিথ্যা নয় ভাবী সাহেবা, কারণ আমার ধীরা-মীরার চেয়ে ইরা অনেক ভাল। বললেন মিঃ ইব্রাহীম।

মিঃ নিয়াজী চুপ করে ছিলেন, তিনি মনে মনে খুশি হয়েছেন কথাটা শুনে তা বেশ বোঝ যাচ্ছে তার মুখোভাব লক্ষ্য করে।

মিঃ ইব্রাহীম বললেন-মিঃ নিয়াজী, আপনি সম্পূর্ণ নীরব, এর কারণ কি বন্ধু।

ছেলের মা যখন মেয়ের প্রশংসা করছেন তখন আমার আর বলবার কি আছে! আমি আপনার ভাবী সাহেবার মতে একমত।

মিঃ ইব্রাহীম হেসে উঠলেন, তারপর বললেন দেখলেন এক এক কথায় সব কাজ শেষ। লোকে বলে, বিয়ের নাকি বিয়াল্লিশ কথা......

মিঃ নিয়াজী বললেন-ঘটকের মাধ্যমে হলে তাই হয়। সব সময় সব কাজ নিজেরা যদি বলি করি তাহলে এতো ঘোর-প্যাঁচ কিছু হয় না বা ঘটে না কোনো কাজে। মেয়ে যখন আরমানের মা দেখেছেন তখন আমার বলবার কিছু নেই।

মিসেস নিয়াজী বললেন আরমান রাজি হলেই হয়।

মিঃ ইব্রাহীম বললেন–বাবা-মা যদি রাজি থাকেন তাহলে সন্তান রাজি হবেই।

মিঃ নিয়াজী হেসে বললেন–আপনি সরল মানুষ তাই এ কথা বললেন। আজকাল বাবা মা রাজি থেকেও অনেক সময় বিয়েতে সন্তানকে রাজি করানো সম্ভব হয় না।

মিঃ ইব্রাহীম বললেন–আরমান তেমন ছেলেই নয়। আপনারা রাজি হলেই সে রাজি, এ বিশ্বাস আমার আছে। আর সে বিশ্বাস আছে বলেই আমি এসেছি। জানি আপনাদের কাছে বিমুখ হবো না।

বিপুল আনন্দ আর ভরসা নিয়ে ফিরে গেলেন মিঃ ইব্রাহীম মিঃ নিয়াজীর বাসভবন থেকে।

মিসেস নিয়াজী রাতে খাবার টেবিলে সন্তান আরমানের কাছে কথাটা পাড়লেন।

হেসে উঠলো আরমান মায়ের কথা শুনে।

মিসেস নিয়াজী বললেন–এবার না করলে শুনছি না। কারণ বেশ কয়েক জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, সব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিস।

এবার তোমার কথা না রাখলে তুমি আমাকে তিরস্কার করবে, এই তো?

আরমান।

আম্মি, আমাকে সব ব্যাপারে তুমি বলতে পারো আমি মেনেও নেবো, কিন্তু ঐ একটি ব্যাপারে আমি অক্ষম।

কেন বলতো?

এই তো সবে বিদেশ থেকে ফিরে এলাম, কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকতে দাও।

নিশ্চিন্ত মানে? বিয়ে হলে তুই চিন্তায় পড়বি?

তা নয় তো কি! বিয়ের পর স্বাধীনতা হারাবো, বুঝলে আম্মি।

আমি বুঝি তোর আব্বুর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছি?

তোমার সঙ্গে তুলনা হয় না কোনো মেয়ের।

ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই। বললেন মিসেস নিয়াজী।

মিঃ নিয়াজী খাবার টেবিলে ছিলেন না তাই মাতা-পুত্র মিলে চলছিলো আলাপ আলোচনা।

এমন সময় মিঃ নিয়াজী উপস্থিত হলেন। তিনি একটা চেয়ার নিয়ে বসে বললেন–বেশ তো গল্প জমিয়েছো মা-ছেলে মিলে? আরমানকে বলেছো সব কথা?

আরমান তখন আসন ত্যাগ করে উঠে পড়েছে। খাওয়া তার শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

মিসেস নিয়াজী বললেন–তুমি খাবে না?

না।

দুধ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি

মিঃ নিয়াজী সে কথায় কান না দিয়ে বললেন—আরমান রাজি হয়েছে?

কই তাকে রাজি করতে পারলাম? একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন মিসেস নিয়াজী।

মিঃ নিয়াজী বললেন—-আরমান বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর কত বড় বড় ঘর থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো, কই পেরেছে তাকে রাজি করাতে পারবে না– পারবে না সে এত সহজে রাজি হবে না আমি জানতাম।

কথাটা বলে মিঃ নিয়াজী উঠে পড়লেন, পা বাড়ালেন তিনি নিজ কক্ষের দিকে।

*

এরপর কয়েক দিন কেটে গেছে।

মিসেস ইব্রাহীম এসেছিলেন বেড়াতে, কথায় কথায় কথাটা পাড়বেন ভাবছেন তিনি।

কিন্তু মিসেস নিয়াজী দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে বলেই ফেললেন–বড় দুঃখ নিয়ে জানাতে বাধ্য হলাম বোন আরমানকে আমি রাজি করাতে পারলাম না।

এর বেশি বলতে হলো না, কারণ মিসেস ইব্রাহীম এমনি একটি কিছুই আশা করেছিলেন। আরমানকে জামাতা হিসিবে পাওয়া পরম ভাগ্য ছাড়া কিছু বলা যায় না, কেন না কান্দাই-এর হিরাগো শহরের সবচেয়ে নামী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি মিঃ আল হামজা কোরেশীর একমাত্র কন্যা হিমোর সঙ্গে আরমানের বিয়ের প্রস্তাব এসেছিলো। হিমো হিরাগো শহরের সবচেয়ে সুন্দরী তরুণী, তবু রাজি হয়নি আরমান।

কথাটা মিঃ ইব্রাহীম জানতেন না, আর জানতেন না বলেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন বন্ধু মিঃ নিয়াজীর কাছে।

মিসেস নিয়াজীর মুখে কথাটা শুনে কোনো জবাব দেননি মিসেস ইব্রাহীম, শুধু একটু হেসেছিলেন।

এর কিছুদিন পর হঠাৎ মিঃ হামজা মিঃ ইব্রাহীমের বাসায় গিয়ে হাজির হলেন।

মিঃ ইব্রাহীম অবাক হলেন এমন একজন ব্যক্তিকে হঠাৎ করে আসতে দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন–হঠাৎ কি মনে করে মহান ব্যক্তির আগমন?

চোখ দুটো দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিলো তবু নিজকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে বললেন মিঃ হামজা–আপনি এ অপমান সহ্য করলেও আমি এ অপমান হজম করবো না।

মিঃ ইব্রাহীম সরল-সহজ মানুষ, তিনি বললেন-আমি ঠিক আপনার কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম না।

বললেন মিঃ হামজা মিঃ নিয়াজীকে আমি কয়েক বার ক্রয় করতে পারি। আমার একমাত্র কন্যা হিমোর সঙ্গে মিঃ নিয়াজীর পুত্রের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি। এ অপমান……

হেসে বললেন মিঃ ইব্রাহীম–ছেলেমেয়ে থাকলে প্রস্তাব আসবে এবং বিফলও হতে হবে, তাতে এমন কি যায় আসে!

শুনলাম আপনিও বিফল হয়েছেন?

হা হামজা সাহেব।

আপনি সহ্য করলেও আমি করবো না।

দেখুন মিঃ নিয়াজীর কোন দোষ নেই…

তার সন্তানকে তিনি রাজি করাতে পারেন না এটা আমি বিশ্বাস করি না।

বসুন মিঃ হামজা, সব কথা হবে।

মা, বসতে আমি আসিনি তবে যখন জানলাম আপনিও আপনার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মিঃ নিয়াজী সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন এবং আপনাকেও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে।

ওতে আমি দুঃখ পাইনি মিঃ হামজা।

কিন্তু আমি পেয়েছি...কথা শেষ না করেই যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনিভাবেই চলে গেলেন।

মিঃ ইব্রাহীম মিঃ হামজার কুদ্ধভাব লক্ষ্য করে একটু হাসলেন মাত্র।

ততক্ষণে মিঃ হামজার গাড়ি বেরিয়ে গেছে ফটকের বাইরে।

*

চমকে উঠলো আরমান।

তাদের অফিসের সামনে কয়েকজন লোক কিছু আলাপ-আলোচনা করছিলো।

আরমানের গাড়ি এসে অফিসের সামনে থামতেই লোকগুলো বিচ্ছিন্নভাবে সরে গেলো। আরমান যাকে লক্ষ্য করে চমকে উঠেছিলো সে অন্যান্যের মধ্যে আত্মগোপন করার চেষ্টা করতেই আরমান গাড়ির দরজা খুলে নেমে গেলো এবং দ্রুত এসে কাঁধে হাত রাখলো তার।

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো–বাবুজী আপনি!

হাঁ! তুমি আমাকে দেখে অমন করে লুকিয়ে সরে পড়ছিলে কেন বলো ত

লজ্জায় বাবুজী।

লজ্জায় মানে?

আপনাকে কি বলবো বাবুজী, আমার একটু নেশা আছে তাই...হাত দুখানা আরও ভাল করে লুকোতে চেষ্টা করলো সে।

আরমান দেখলো ওর হাতে দুটো মদের বোতল। আর ঐ বোতল দুটোকে সে লুকিয়ে নিয়ে সরে পড়ছিলো।

বললো আরমান—-মংলুর বাবা, মংলু কেমন আছে?

ভাল আছে। ও সব সময় আপনার কথা বলে। আপনি ওকে যাদু করেছেন বাবুজী। আপনি কবে আসবে আমাদের সরাইখানাতে?

ঠিক বলতে পারছি না তবে অল্পদিনের মধ্যেই যাবো।

মংলুর বাবার চোখ দুটো খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো।

আরমান গাড়িতে চেপে বসলো। অফিসের দারোয়ান গেট খুলে ধরে সেলুট দিয়ে দাঁড়ালো।

গাড়ি ভেতরে চলে গেলো।

আরমান যখন অফিসে আসে তখন সে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে আসে। বিশেষ করে আরমান নিজ গাড়ির জন্য কোনো ড্রাইভার পছন্দ করতো না, যদিও তাদের গাড়ি ও ড্রাইভার ছিলো অনেকগুলো।

আরমানের গাড়ি অফিসকক্ষের সামনে এসে থামতেই প্রহরী গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

নেমে পড়লো আরমান।

অফিসরুমে পৌঁছতে ছ'সাত খানা কক্ষ পেরুতে হয়।

আরমান সবগুলো কক্ষ পেরিয়ে নিজ রুমে প্রবেশ করলো।

যখন আরমান কক্ষগুলো পেরিয়ে আসছিলো তখন কর্মরত কর্মচারিগণ সবাই নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে আরমানকে সম্মান দেখাচ্ছিলো।

এটা তাদের অভ্যাস।

আরমান বিদেশ থেকে ফেরার পর মিঃ আব্বু নিয়াজী সন্তানকে তার কারবারে যোগ দেবার জন্য বলেন এবং অফিসে এসে তাকে সব বুঝিয়ে দেন। যদিও মিঃ নিয়াজীর এখনও অবসর গ্রহণের সময় আসেনি। তিনিও প্রতিদিন অফিসে আসেন। তবুও মিঃ নিয়াজী চান তিনি বেঁচে থাকতে আরমান ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিক।

পিতার ইচ্ছা আরমান মেনে নিয়েছে এবং সে মনপ্রাণ দিয়ে পিতাকে সহযোগিতা করে আসছে।

আরমান অফিসকক্ষে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলো। তার রুমে বসে বই পড়ছে এক তরুণী। উগ্র সেন্টের গন্ধে অফিসকক্ষ ভরপুর।

আরমান বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তরুণীর দিকে, ভাবলো কার এমন সাহস যে তার বিনা অনুমতিতে তার অফিস রুমে প্রবেশ করে।

জুতোর শব্দে ফিরে তাকালো না তরুণী, যেমন বসেছিলো তেমনি বসে রইলো।

আরমান একটু কেশে শব্দ করলো।

তবুও তরুণী তেমনি মনোযোগ সহকারে বই পড়ছে।

এবার আরমান বসলো এসে নিজের আসনে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো–তুমি!

এইবার বই রেখে চোখ তুললো তরুণী।

তরুণীর দুচোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বললো সে-চিনতে ভুল করোনি তাহলে?

হঠাৎ কি মনে করে?

এতদিন জানতাম তুমি আমাকে ভোলোনি, কিন্তু……

তার মানে? ভ্রুকুঞ্চিত করে কথাটা বললো আরমান।

তরুণী খিল খিল করে হেসে উঠলো, তারপর বললো—বিদেশ থেকে ফিরে নতুন জীবন লাভ করেছে, ভুলে যাবার কথাই বটে!

মিস হিমো, আপনি....

মিস নয়, শুধু হিমো বললো যেমন করে আগে ডাকতে, আর আপনি নয় তুমি বলবো, কারণ পূর্বেও তুমি আমাকে তুমিই বলতে।

হিমো বা মিস হিমো কোনোটাই বলা আমার কাছে কঠিন নয়।

তবে কেন আমার বাবাকে এমনভাবে উপেক্ষা করেছিলে?

উপেক্ষা করেছি তোমার বাবা মিঃ হামজা কে?

তা নয় তো কি!

তোমার বাবা হলেন হিয়োগার এক মহারথী বা মহাপুরুষ আর আমি তাকে উপেক্ষা করবো, বলল কি!

তুমি আমার বাবাকেই শুধু উপেক্ষা করোনি, আমাকেও অপমান করেছে।

এ সব কি বলছো হিমো?

যা সত্য তাই বলছি।

তোমার হেঁয়ালিপূর্ণ কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া....

এসব শোনার তোমার সময় নেই, তাই না?

অফিসটাইমে, বহু কাজ জমে আছে সারতে হবে।

তাহলে তুমি বিরক্ত হচ্ছো?

আরমান কোনো জবাব দিলো না।

হিমোর দুচোখে আগুন ঝরে পড়ছে। সে অধর দংশন করে বললো—আজ তুমি বিরক্ত হবেই, কারণ তোমার জন্য হিরোগা শহরের অনেক সুন্দরী রাণীই তপস্যা করছে।

চমঙ্কার কথা বলতে জানো বলেই আমি তোমাকে স্নেহ করতাম।

স্নেহ!

হাঁ, তোমার কথাগুলো ভারী সুন্দর, তাই সহপাঠিনী হিসেবে আমার কাছে তুমি প্রিয় ছিলে।

আমার মধ্যে আর কিছু খুঁজে পাওনি তুমি!

যাক ও সব কথা, এবার বলো কেন এসেছো?

বোকা সেজে নেকামি করলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। আমি কি তোমার যোগ্য নই……

আরমান অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

ভাগ্যিস কক্ষের শব্দ বাইরে যেতো না, তাই আরমানের হাসির শব্দ কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

হিমো বইখানা ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো — বাবাকে ফিরিয়ে দিয়ে তুমি ভাল করোনি। এর প্রতিদান তুমি পাবে।

কথাটা বলে মিঃ হামজার কন্যা মিস হিমো বেরিয়ে গেলো দ্রুতগতিতে।

অফিসকক্ষের প্রতিটি রুম পেরুতে গিয়ে তাকে অসংখ্য দৃষ্টিতে নিশ্চুপতিত হতে হলো। কর্মরত কর্মচারিগণ অবাক হয়ে গেছে, প্রবেশ মুহূর্তেও সে কারও দিকে পেক্ষ না করে যেমন ছোট সাহেবের রুমে প্রবেশ করেছিলো তেমনি প্রস্থানকালেও সে কোনো দিকে একবারও তাকিয়ে দেখলো না।

হিমো বেরিয়ে যেতেই আরমান নিজের কাজে মনোযোগ দিলো।

অবশ্য কাজে মনোনিবেশ করলেও তার মনে নানা কথার উদ্ভব হচ্ছিলো। কলেজ জীবন থেকে ইউনিভার্সিটি জীবন। তার সঙ্গে পড়াশোনা করতে কয়েকজন তরুণী, তাদের মধ্যে একজন মিস হিমো।

সুন্দরী বলে তার নিজের মধ্যে একটা গর্ব ছিলো। আর সে কারণেই হিমো নিজকে অসাধারণ মনে করতো। শুধু অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণীই ছিলো না, ছিলো তার পিতার বিপুল ঐশ্বর্য, সেটাও তার গর্বের একটা দিক।

হিমোকে নিয়ে তার সহপাঠীদের মধ্যে একটা বিপুল আগ্রহ বা কৌতূহল ছিলো। সবাই চাইত হিমোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, শুধু ব্যতিক্রম ছিলো আরমান।

আরমান কোনো সময় মিস হিমোর কাছে নিজকে ধরা দিতে চাইতো না, বরং এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতো। কারণ আরমান নিজকে হিমোর চেয়ে অনেক বেশি সর্বগুণসম্পন্ন মনে করতো। শুধু সুন্দর নয়, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলো আরমান। সৌন্দর্যের সঙ্গে গুণের পরিধিও কম ছিলো না তার। লেখাপড়ায় আরমান প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় সারিতে পা রাখেনি কোনোদিন। একমাত্র নূরকে আরমান ভালবাসততা এবং বিশ্বাস করতো।

হিমোর সঙ্গে সহপাঠীরা মিল দিয়ে চলতে চাইলেও হিমোর দৃষ্টি ছিলো আরমানের দিকে। মনেপ্রাণে সে আরমানকে কামনা করতো। আরমানকে ঘিরে হিমো রচনা করেছিলো রঙিন স্বপ্ন। আরমান তাকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও তেমন করে বুঝতে দিতো না। হিমোর সঙ্গে এমন ব্যবহার সে দেখাতে যে হিমো ভাবতো আরমান তাকে ভালবাসে।

হিমোর সেই ধারণা আজও ছিলো যা নষ্ট হয়নি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও। সে জানতো আরমান বিদেশ থেকে ফিরে এসে তাকে খুঁজে নেবে কিন্তু তার সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো আরমান বিদেশ থেকে এসেও যখন তার কোন খোঁজখবর নিলো না। বন্ধু নূরকে নিয়ে সে মেতে রইলো। তখন রাগে-অভিমানে হিমো নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করছিলো, ইচ্ছা করেও সে দেখা করেনি বা করতে যায়নি আরমানের সঙ্গে।

কন্যার মনের কথা বুঝতেন মিঃ হামজা। তাই তিনি আরমানের পিতার কাছে প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি জানতেন তাকে সন্তানের জন্য প্রস্তাব নিয়ে আসতে দেখে মিঃ নিয়াজী খুশি হবেন।

অবশ্য সে কথা মিথ্যা নয়, মিঃ হামজার মত স্বনামধন্য ব্যক্তি যখন মিঃ নিয়াজী বাসভবনে এলেন তখন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

মিঃ হামজার প্রস্তাব তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন আরমান নিশ্চয়ই রাজি হবে। কিন্তু আরমান এ প্রস্তাবে মত তো দেয়ইনি, উল্টো বলেছিলো, এখন এ সব কথা তাকে না বলাই ভাল, কারণ সবে সে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে, অনেক কাজ বাকি।

মিঃ ইব্রাহিম যখন নিজ কন্যা ইরার প্রস্তাব নিয়ে এলেন তখন মিঃ নিয়াজী তাকে বিমুখ করে ফেরাতে পারলেন না। তিনি এবং তার স্ত্রী মিসেস নিয়াজী কথা দিলেন তার কনিষ্ঠা কন্যা মিস ইরাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নেবেন যদিও তারা মনে মনে কিছুটা আশঙ্কিত হয়েছিলেন কিন্তু একটা সাহস বা মনোবল ছিলো আরমান মিঃ ইব্রাহীমের কন্যা ইরার প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে না।

আরমান মিঃ ইব্রাহীমের কন্যার বিয়ের প্রস্তাবকেও গ্রাহ্য করলো না। পিতা-মাতাকে সে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে, তার এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়। কারণ সে নিজে গুছিয়ে না উঠে বিয়ে করবে না মানে তার পিতাকে ব্যবসা ব্যাপারে সাহায্য করাই হলো উদ্দেশ্য, এ ছাড়া জনহিতকর কিছু কাজ সে করে যেতে চায়।

উদ্দেশ্য আরমানের মন্দ নয়।

মিঃ নিয়াজী সন্তানের মনোভাব বুঝতেন এবং সে কারণে আরমানকে বিয়ের ব্যাপারে বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন।

মিসেস নিয়াজী বড় আশা করেছিলেন সন্তান বিদেশ থেকে ফিরে এলে তাকে বিয়ে দিয়ে নতুন এক অতিথিনীকে ঘরে আনবেন এবং তার হাতে সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হলো। আরমান কিছুতেই বিয়েতে রাজি হলো না।

আরমান সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মায়ের ঘরে প্রবেশ করে দেখলো, মা গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

মৃদু হেসে এগিয়ে গেলো আরমান।

পাশে বসে বললো—কি হয়েছে আম্মি?

হবে আবার কি, সব আমার নসিব।

তার মানে?

হামজা সাহেবকে না হয় বিমুখ করলি তাই বলে ইব্রাহীম সাহেব……

ও এই কথা, তুমি কিছু ভেবো না আম্মি, ঠিক সময়মত তোমাদের সব কথা আমি মেনে নেবো! লক্ষী আম্মী, একটুও মন খারাপ করোনা যেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন মিসেস নিয়াজী–আমার কি সাধ হয় না সন্তানের বৌয়ের মুখ দেখি? এমন ভাগ্য একটি মেয়েও যদি থাকতো আমার তবুও সান্তনা ছিলো……

তোমার পাকা চুল তুলে দিতো, এই তো? শোন আম্মি, এমন আশা করোনা যে, তোমার পুত্রবধু এসে তোমার সেবাযত্ন করবে। হাসলো আরমান।

বললেন মিসেস নিয়াজী—আশা আমি করি না, শুধু

তুমি যতই লুকোতে চেষ্টা করো কিন্তু আমি জানি সন্তান লালন পালন করে কোনো মা পুত্রবধু নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হতে পারেনি….

মিসেস নিয়াজী বললেন–এ তুই কি বলছিস আরমান।

হাঁ আম্মি, তুমি জানো না আজকাল মেয়েরা স্বামী গ্রহণ করে বন্ধু হিসেবে, সাথী হিসেবে একজনকে পাশে পাবার জন্য, সংসারধর্ম পালন করার জন্য নয়।

আরমান।

হাঁ আম্মি, তুমি সেকেলে মেয়ে, বুঝবে না আজকালকার মেয়েদের স্বভাব। তারা শুধু সৌখিন পুতুলের মত সামগ্রী হয়ে থাকতে চায়। বিলাসিতা ছাড়া তাদের যেন ভাববার কিছু নেই। গাড়ি, বাড়ি, গহনা, সুন্দর দীপ্ত বলিষ্ঠ স্বামী…

আরমান এর কোন্‌টা আমার নেই বলতো?

কথা শেষ করতে দাও।

বল দেখি কি বলতে চাস তুই?

এসব পেয়েও খুশি হবে না তারা, যদি থাকে স্বামীর সংসারে স্বামীর মা-বাবা ছোট ভাই বোন অথবা কোনো আত্নীয় স্বজন। আজকাল মেয়েরা চায় স্বামীর সংসারে কোনো ঝামেলা না থাক। সব সময় স্ত্রীকে নিয়েই স্বামী ব্যস্ত থাক এটাই চায় আধুনিক স্ত্রীরা। তাহলে তুমিই বলল আম্মি, বৌ ঘরে এনে কি উপকার হবে তোমার? না পাবে সেবাযত্ন, না পাবে তার দ্বারা কোনো সংসারের সাহায্য বরং নানা অসুবিধার সৃষ্টি করবে তোমার আকাক্ষিতা স্নেহধন্যা পুত্রবধূ। এমন উৎকট বায়না ধরে বসবে যা সহ্য করা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে।

এ সব কি বাজে কথা বলছিস তুই?

যা সত্য তাই বলছি আম্মি। তোমরা সেকেলে মেয়ে, সংসার ধর্ম পালন করাই ছিলো তোমাদের ব্রত। স্বামীবাড়ির গুরুজনদের সেবাযত্ন, আদর্শ সন্তান পালনে নিষ্ঠাবান জননী গৃহিণী, এমন কি সেদিক হিসেবেও তোমরা অদ্বিতীয়। আর আজকাল তরুণীর ঠিক তার উল্টা। বলল আম্মি, এসব একটিও কি মিথ্যা বলেছি। তুমি যাই বলো আমি মোটেই এমন মেয়ে বরদাস্ত করতে পারবো না, কাজেই বিয়ে করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়…

ও এই কথা!

না আম্মি, শুধু এই কথা নয়, কাজে অকাজে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে এ আমি চাই না।

আরমান তাই বলে…….

সময় হলে আমি নিজেই জানাবো তোমাকে। এখন বেশ আছি আমি।

মিসেস নিয়াজী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

*

আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো মিঃ আব্বু নিয়াজীর। চোখ মেলে তাকাতেই বিস্ময়ে হতভম্ব হলেন তিনি। কক্ষের বৈদ্যুতিক ডিম লাইটের আলোতে তিনি দেখলেন, পাশের জানালার। শাশী থেকে সরে গেলো একটা বিকট চেহারার মুখ, দুটি লোমশ বাহু।

মিঃ নিয়াজী চিৎকার করে ডাকলেন–আরমান! আরমান। আরমান..

পাশের ঘরে জেগে উঠলো আরমান।

সে দ্রুত দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

পাশে নিদ্রা ভেঙে গেছে মিসেস নিয়াজীর। তিনি ধড়মড়িয়ে শয্যায় উঠে বসে স্বামীকে। ভীতভাবে সন্তানের নাম ধরে ডাকতে দেখে অবাক এবং বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–কি হয়েছে তোমার?

আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মিঃ নিয়াজী ওদিকের জানালা, বললেন ভয়বিহ্বল কণ্ঠে—-ভূত! আমি ভূত দেখেছি আরমানের মা…

বলো কি!

হাঁ।

সেকি!

ভীষণ চেহারা একটা মুখ……

ঐ জানালায় তুমি ভীষণ চেহারার একটি মুখ দেখেছো?

হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের সে মুখ নয়।

এ তুমি কি বলছো?

তোমাকে কি বলবো কী ভয়ংকর সে মুখ।

আরমান এসে দাঁড়ালো পিতামাতার পাশে। অবাক কণ্ঠে বললো—কি হয়েছে আব্বু

মিঃ আব্বু নিয়াজী আরমানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভীতকণ্ঠে বললেন-ভূত দেখেছি আরমান। আমি নিজের চোখে ভূত দেখেছি। ঐ জানালায়……।

আরমান জানালার দিকে তাকিয়ে পুনরায় পিতার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো আব্বু!

হাঁ, হাঁ আরমান ভয়ংকর সে মুখ।

আরমান গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলো পিতার ভীত আতঙ্কিত মুখমন্ডলের দিকে। গভীরভাবে কিছু যেন সে চিন্তা করছে।

হঠাৎ আবার সেই মুখ ভেসে উঠলো জানালায়।

নিয়াজী সাহেব চিৎকার করে উঠলেন—ঐ সেই মুখ।

আরমান ছুটে গেলো সেইদিকে।

ততক্ষণে মুখটা সরে গেছে জানালাপথ থেকে।

থামলো রবিন।

একাধারে সে এতক্ষণ কাহিনীটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলছিলো। কোথাও একটু বাধেনি তার। নিয়াজী সাহেব, বনহুর অথবা মনিরা কেউ টু শব্দও করেনি এতক্ষণ।

বনহুর তাকালে নিয়াজী সাহেবের মুখের দিকে, দুচোখে তার প্রশ্ন দৃষ্টি।

নিয়াজ সাহেব বললেন–হাঁ, সর্বক্ষণ এই মুখখানা আমাকে ভীত আতঙ্কিত করে রেখেছে। আমি ভাবতেও পারছি না কিছু…জানালার দিকে তাকিয়ে মিঃ নিয়াজী হঠাৎ আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন–আবার সেই মুখ, ঐ যে–ঐ যে দেখুন মিঃ আসলাম…

বনহুর তাকালো সেইদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা মুখ সরে গেলো, বনহুর যতটুকু দেখলো তাতেই বিস্মিত হলো, একটি ভয়ংকর মুখ তবে সেটা মানুষের মুখ ছাড়া কিছু নয়।

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়লো।

মিঃ নিয়াজীর চোখেমুখে ভীত আতঙ্কিত ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। আংগুলের ফাঁক থেকে পাইপটা খসে পড়েছে মেঝের কার্পেটে।

মনিরা বলে উঠলো—আমিও দেখেছি সেই মুখ। কি ভীষণ আর ভয়ংকর।

রবিন বললো–আমি আরও একবার এই বিস্ময়কর কাহিনী কারও কাছে ব্যক্ত করার মুহূর্তে সেই ভয়ংকর মুখ শাশীর ফাঁকে দেখেছি। তাই আজও আমার আশংকা হচ্ছিলো...

বনহুর বললো–ঠিক আছে, আর কাউকে এ কাহিনী বলার প্রয়োজন নেই রবি। কথাটা বলে বনহুর রবিনের পিঠ চাপড়ে দিলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো সে–আজ তবে চলি মিঃ নিয়াজী আবার দেখা হবে।

আমাকে এই ভয়ংকর অবস্থায় রেখে যাবেন? করুণ কণ্ঠে বললেন মিঃ নিয়াজী।

সত্যি তাকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিলো এই মুহূর্তে।

বনহুর বললো–আজ ও আর আসবে না। তবু আপনি সাবধানে থাকবেন।

মিঃ নিয়াজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আরমানের কোনো ক্ষতি হবে না তো?

বললো বনহুর—সে এখন কোথায় সঠিক বলতে পারেন?

ঠিক পারছি না, কারণ অফিস থেকে মাঝে মাঝে সে নুরুজ্জামানের ওখানে যায়। কোনো কোনো দিন নূরকে সঙ্গে নিয়েই বাসায় ফেরে আরমান।

মিঃ নিয়াজী, আপনি চিন্তা করবেন না। কথাটা বলে হাত বাড়ালো বনহুর মিঃ নিয়াজীর দিকে।

করমর্দনের পর বিদায় গ্রহণ করলো বনহুর আর মনিরা।

গাড়িতে বসে বললো মনিরা–কিছু বুঝলে?

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোয়া সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরে বললো–হু।

আমার বিশ্বাস এ রহস্য উদঘাটনে তুমি সক্ষম হবে।

তোমার বিশ্বাস যেন অক্ষুণ্ণ থাকে মনিরা।

*

আম্মু!

কে?

আমি।

হঠাৎ কি মনে করে এসেছিস নূর।

কথা আছে তোমার সঙ্গে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো নূর।

মনিরা নূরকে এমন গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলতে দেখে একটু অবাক হলো। বললো মনিরাবস্ শুনি কি হয়েছে?

নূর পূর্বের মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আম্মু–তুমি কি আরমানদের বাসায় গিয়েছিলে? সত্যি করে বলে গিয়েছিলে তুমি?

হাঁ গিয়েছিলাম।

কে তোমার সঙ্গে ছিলো?

মনিরার কানের কাছে প্রতিধ্বনি হলো স্বামীর সেই কথাগুলো, আমি চাই না নূর এসব জানুক......আমি চাই না নূর এ সব জানুক।

মাকে নিশ্চুপ দেখে বললো নূর—যা শুনলাম তা কি তাহলে সত্য?

কি শুনেছো নূর?

মিঃ নিয়াজী সাহেব বললেন তুমি কাউকে নিয়ে তার বাসায় গিয়েছিলে?

আমি আজ কিছু বলতে পারবো না তোকে সব পরে বলবো।

নূর ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—তোমাকে বলতে হবে কে তোমার সংগে নিয়াজী সাহেবের বাসায় গিয়েছিলো।

বলবো না। তুই ও কথা জানতে চাস নে।

আম্মু

হাঁ, চলে যা এখন থেকে। আমি বলবো না।

বেশ যাচ্ছি। নূর রাগতভাবে চলে গেলে সেখান থেকে।

মনিরার মুখখানা ম্লান হয়ে পড়লো। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কি করে সে বলবে সব কথা। নূর রাগ-অভিমান করে চলে গেলো, হয়তো তাকে ভুল বুঝেছে। বুঝুক তবুও তার বলা চলবে না, এতে কোনো না কোনো অসুবিধা হতে পারে।

নূর ফিরে এলো তার বাংলোয়।

একটা গভীর চিন্তার ছাপ পড়লো তার মনে! কে সে ব্যক্তি যাকে নিয়ে তার আব্বু গিয়েছিলো মিঃ নিয়াজীর বাসায়।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

নূর রিসিভার তুলে নিলো হাতে। ওপাশ থেকে ভেসে এলো সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠস্বর.....বন্ধু আরমানকে নিয়ে বেশি ভাবতে যাবেন না, কারণ সে এখন আমার লোক......হয়তো কথাটা বুঝতে পারছেন না, বুঝতে পারবেন তাকে ভালভাবে খেয়াল করলে...তার দেহে যে ইনজেকশন পুশ করা হয়েছে তার মূল্য কয়েক কোটি টাকা.....আপনাকে জানিয়ে রাখলাম তাকে আমার চাই–কোনো বাধাই তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

নূর একটি কথাও বলার সুযোগ পেলো না। তবে বুঝতে পারলো আরমান গভীর কোনো রহস্যজালে আবদ্ধ হয়েছে। সে রহস্যজাল ভেদ করা কঠিন হবে। সে ব্যক্তি যে আরমানকে নিজের আয়ত্তে নিতে চায়। নূর মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলো। সব যেন গভীর রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছে।

নুর লক্ষ করেছে আজকাল আরমান সব সময় নিজকে সাবধানে সবার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। খুব অল্প কথা বলে। তার চোখেমুখে একটা অদ্ভুত ভাব পরিলক্ষিত হয়। আরমানের এই পরিবর্তন তাকেই শুধু ভাবিয়ে তোলেনি তার বাবা মিঃ নিয়াজীও বেশ চিন্তাযুক্ত আছেন।

নূর গত কয়েক দিনের কথাগুলো বেশ করে ভাবতে থাকে। মিঃ নিয়াজী বলেছেন, আরমান কাঠের সন্ধানে সালিমা বনে গিয়েছিলো, সেখান থেকে ফিরে আসার পর সে যেন কেমন হয়ে গেছে। সব সময় তার নিজের ঘরে একা থাকতে চায়। কথা খুব কম বলে, এমন কি তার মার সঙ্গেও সে বড় একটা কথা বলে না। যে ব্যক্তি তাকে এইমাত্র ফোন করেছিলো কে সে, নিশ্চয়ই সে যা বললো তা সত্য। আরমানের দেহে এমন কোনো ওষুধ পুশ করা হয়েছে যা তার মধ্যে এনেছে একটা পরিবর্তন যা তাকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। গভীর একটা রহস্য আরমানের জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে এবং রহস্যজালে জড়িয়ে পড়ছে তারা সবাই। এমনকি তার আম্মুও জড়িয়ে পড়েছে। সত্যি কথা লুকোতে চায় সন্তানের কাছে। কে সে ব্যক্তি যে তার আম্মুকে মিঃ নিয়াজীর বাসায় সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলো।

নানা রকম চিন্তা নূরের মনে আলো রে চললো। এর সমাধান তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

এখানে নূর যখন ব্যাপারটা নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে ভাবছে তখন বনহুর হাজির হলে গিয়ে মিঃ ইব্রাহীমের বাসায়।

মিঃ ইব্রাহীম তাকে সসম্মানে বসালেন এবং কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে। আলাপ আলোচনা হলো। বনহুর কোনো এক ব্যবসায়ীর বেশে হাজির হয়েছিলো। মিঃ ইব্রাহীম তার আসল পরিচয় জানলে তাকে এভাবে সমাদর করতেন না।

বেশিক্ষণ বনহুর সেখানে অবস্থান না করে ফিরে এলো।

*

বনহুরের শহরের আস্তানা।

মোহসীন তার শহরের আস্তানার বিশ্বস্ত অনুচর। সর্দারকে হঠাৎ এ সময়ে আস্তানায় আসতে দেখে অবাক হলো কিছুটা। কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—সর্দার কিছু বলবেন?

হাঁ, মোহসীন তোমার সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ আছে।

বলুন সর্দার।

তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে আমার সঙ্গে। ড্রাইভারের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নাও।

আচ্ছা সর্দার। চলে গেলো মোহসীন।

বনহুর কিছু কাগজপত্র ঘেঁটে বের করলো একটা ম্যাপ। ম্যাপখানা মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখছিলো টেবিলে মেলে ধরে।

একটা ফুল পাওয়ার বাল্ব জ্বলছিলো।

বনহুরের আংগুলের ফাঁকে সিগারেট।

অর্ধদগ্ধ সিগারেট থেকে কুন্ডলি পাকিয়ে ধুম্ররাশি ছড়িয়ে পড়ছিলো কক্ষটার মধ্যে। দামী সিগারেটের গন্ধে ভূগর্ভ কক্ষটি ভরপুর। বনহুর গভীরভাবে লক্ষ করছিলো সেই ম্যাপখানা।

এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ালো দিপালী।

পরনে লালপেড়ে সাদা ধবধবে শাড়ি। এলায়িত কেশ রাশি ছড়িয়ে আছে পিঠের চারপাশে। ললাটে চন্দনের সাদা টিপ।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো দিপালী, তারপর ডাকলো–রাজকুমার?

সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিলো বনহুর, চোখ তুলে তাকালো, অবাক হয়ে বললো—দিপালী তুমি?

হাঁ।

বনহুর ওর পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ করতে লাগলো।

বললো দিপালী-0আপনি আমাকে অমন করে দেখছেন কেন রাজকুমার?

তোমাকে নতুন রূপে দেখছি।

রাজকুমার।

তুমি এখনও আমাকে ঐ নামে ডাকবে দিপালী?

চিরদিন আপনি আমার কাছে রাজকুমার রূপেই থাকবেন। কতদিন আপনাকে দেখিনি। যখন জানলাম আপনি এসেছেন তখন থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম। রাজকুমার, ঐ ম্যাপখানায় অমন করে কি দেখছেন?

সালিমা বন কান্দাই থেকে কত দূরে এবং কোন পথে সেখানে যাওয়া যাবে আমি তাই লক্ষ করছিলাম।

দিপালী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—সালিমা বন সে কোথায়?

কান্দাই থেকে বহু দূরে।

আপনি যাবেন রাজকুমার সেখানে?

হয়তো যেতে হবে।

এমন সময় মোহসীন উপস্থিত হলো সেখানে। বললো সে–সর্দার, গাড়ি প্রস্তুত।

বনহুর ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ফিরে তাকালো মোহসীনের দিকে। তারপর দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো–দিপালী চলি কেমন?

আসুন রাজকুমার। ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো দিপালী।

বনহুর আর মোহসীন বেরিয়ে গেলো।

ভূগর্ভ থেকে ওপরে ওঠার সিঁড়িমুখ এমন এক স্থানে–যে স্থানে একটি ভগ্ন সিংহমূর্তির মুখগহ্বর।

বনহুর আর মোহসীন সিংহমুখ গহ্বর হতে বেরিয়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। ভারী এবং মজবুত জীপগাড়ি। ভেতরে প্রচুর অস্ত্র রাখার বাক্স আছে।

মোহসীন গাড়ির দরজা খুলে ধরতেই বনহুর ওঠে বসলো।

বনহুরের শরীরে শিকারী ড্রেস।

মোহসীন ড্রাইভার।

গাড়িখানা বেরিয়ে এলো ভূগর্ভ সুড়ঙ্গপথের বাইরে। গাঢ় সবুজ রঙের জীপ গাড়ি।

মোহসীন ড্রাইভ আসনে আর পাশে বনহুর। পেছন আসনের নিচে নানা ধরনের অস্ত্র এবং বাইনোকুলার এবং সিল্ককর্ড। পানীয় এবং কিছু শুকনো খাবার আর ফলমূল আছে তাদের গাড়িতে।

বনহুর পথের নির্দেশ দিচ্ছে আর মোহসীন গাড়ি চালিয়ে চলেছে। কান্দাই শহর ছেড়ে হীরাঝিলের পথ ধরে গাড়ি এগুচ্ছে।

*

জনহীন পথ।

দু’পাশে ঝোঁপঝাড় এবং বন।

কোথাও বা ধু-ধু প্রান্তর।

এ পথ থেকে দেখা যায় হীরাঝিলের কিছু অংশ। ঐতিহাসিক এ হীরাঝিল। এই হীরাঝিলের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে কত অজানা গোপন কাহিনী। কত নিষ্পেষিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, কত অসহায় নারীর করুণ আর্তনাদ, কত অনাথ তরুণের বুকের রক্ত ঐ হীরাঝিলের দেয়ালে দেয়ালে আজও প্রতিধ্বনি জাগায় অত্যাচারিত ব্যক্তির তীব্র আর্তনাদ।

বনহুর আনমনা হয়ে পড়েছিলো, মোহসীনের কণ্ঠস্বরে তার চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বলে মোহসীন-সর্দার, সামনে হীরাঝিলের শেষ সীমানা, তারপর শুধু ধূ-ধূ প্রান্তর। প্রান্তরটি পেরিয়ে যেতে আমাদের রাত হয়ে যাবে।

হাঁ, তা হবে বটে।

সর্দার, রাতে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা কি সমুচিত হবে?

তা ছাড়া কি করতে চাও?

হীরাঝিলে থেকে গেলে হয় না?

যদি ভাল মনে করো তবে হতে পারে।

তাই ভাল সর্দার। হীরাঝিলে রাত কাটিয়ে ভোরে রওয়ানা দেবো।

কিন্তু হীরাঝিলের অভ্যন্তরের রহস্য আমাদের চলার পথে যদি কোনো বাধা আসে?

মোহসীন নিশ্চুপ হলো।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

বললো বনহুর—মোহসীন, তুমি যখন বলছো তখন হীরাঝিলে রাত কাটিয়ে কাল ভোরে রওয়ানা দেওয়াটাই ভাল হবে।

সর্দার, হীরাঝিল অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি এখন বেশ দূরে চলে এসেছে। তা ছাড়া একটি ব্যাপার আমি লক্ষ করছিলাম।

প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরলো বনহুর মোহসীনের মুখের দিকে।

বললো মোহসীন–একটা শব্দ আমার কানে এসেছে। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের দূর থেকে অনুসরণ করছে।

তুমিও তাহলে আন্দাজ করে নিতে সক্ষম হয়েছে মোহসীন।

সর্দার, শব্দটা কোনো গাড়ির বলে আমার মনে হচ্ছে। তবে অত্যন্ত ক্ষীণ সে শব্দ।

হাঁ, এবং এ কারণেই আমি হীরাঝিলে রাত্রিযাপন করা সমুচিত মনে করিনি। তবে তুমি যখন বলছো তখন চলো ফিরে যাওয়া যাক হীরাঝিল অভিমুখে।

কিন্তু……

আর কিন্তু নয়, চল।

সর্দার!

বলো।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

শুধু তোমার নয়, আমার মনেও ভীষণ একটা সন্দেহ জট পাকাচ্ছে এবং সেই সন্দেহ সত্য কিনা তাই পরীক্ষা করবো বলেই আমার এ যাত্রা। মোহসীন, আমার সন্দেহ যদি সত্য হয় তবে বিরাট এক সাফল্য আসবে আরমানের জীবনে। যদি এ রহস্য আমি উদঘাটনে সক্ষম না হই তবে আরমানের জীবনে আসবে নতুন এক অধ্যায় যা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

তাহলে কি……

হ্যাঁ, হীরাঝিল অভিমুখে গাড়ি ফিরিয়ে নাও। খুব সাবধানে গাড়ি চালাবে, এ পথ অত্যন্ত জটিল। তা ছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে।

আলো জ্বালবো সর্দার?

না, গাড়ির আলো জ্বালার কোনো দরকার নেই।

মোহসীন গাড়ির আলো না জ্বেলে সাবধানে এগুতে লাগলো।

হঠাৎ আবার সেই শব্দটা কানে ভেসে এলো তাদের। গাড়ির ক্ষীণ আওয়াজ।

বনহুর বললো–মোহসীন, অত্যন্ত হাল্কাভাবে গাড়িখানাকে হীরাঝিলের দিকে নিয়ে চলো। গাড়ির সার্চলাইট অফ করে দাও। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ করে চলেছে।

সর্দার, হীরাঝিল আমাদের জন্য নিরাপদ স্থান বলে মনে হচ্ছে না।

এখন হীরাঝিলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বিপদ এলে মোকাবেলা করতে হবে।

অতি সন্তর্পণে গাড়িখানাকে চালিয়ে নিয়ে এক সময় হীরাঝিলের কাছে পৌঁছে গেলো বনহুর আর মোহসীন।

*

বিরাট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা হীরাঝিল। চারপাশে শুকনো ঝিল, মাঝে প্রাসাদ। প্রাচীরের অবস্থা এখন শোচনীয়, ধসে পড়েছে অনেক জায়গা। চারদিকে থমথমে ভাব।

প্রাসাদের অবস্থাও তাই।

দিনেও কোনো পথিক পথ ভুল করে হীরাঝিলের পাশে আসে না। একটা ভীত আতঙ্কিত ভাব বিরাজ করছে হীরাঝিলের চুন-বালি খসে পড়া কংকালটার মধ্যে।

বনহুর আর মোহসীন নেমে এলো গাড়ি থেকে। হীরাঝিলের পাশে একটি বড় ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে রাখলো গাড়িখানা।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন জমাট বেঁধে উঠেছে।

মোহসীন বনহুরের হাতে পাওয়ারফুল টর্চলাইটটা দিলো। বনহুর বা হাতে টর্চ, দক্ষিণ হাতে রিভলভার উদ্যত করে এগুতে লাগলো।

মোহসীন তার পেছনে। ওর হাতেও রিভলভার রয়েছে। ভগ্ন প্রাসাদের সিংহদ্বার পেরুতেই বনহুরের মনে পড়লো, এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে একবার তাকে বন্দী করা হয়েছিলো, নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো হাঙ্গেরী কারাগারে। কিন্তু হাঙ্গেরী কারাগার তাকে আটকে রাখতে সক্ষম হয়নি, বনহুর মুক্ত হয়েছিলো নিপুণ কৌশলে।

বনহুর কিছুটা এগুতেই মোহসীন বললো–সর্দার, আর ভিতরে প্রবেশ করা হবে না।

তা ঠিক, কারণ ভেতরে অনেক রহস্য ওৎ পেতে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সর্দার, সামনে ঐ ভগ্ন কক্ষটার মধ্যে রাতের মত আমরা আশ্রয় নিতে পারি। আংগুল দিয়ে মোহসীন কক্ষটা দেখিয়ে দিলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো সিংহদ্বার পেরিয়ে উঁচু সিঁড়ির ধাপ, তারপর বেশ কয়েকটি কক্ষের ভগ্নপ। একদিন এসব কক্ষে ছিলো আলোর ঝাড় আর মূল্যবান আসবাবপত্র। ছিলো নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র এবং আতর আর গোলাপের সুগন্ধ। কত না ধনাঢ্য ব্যক্তির আগমন ঘটতো এসব কক্ষের অভ্যন্তরে, চলতো রাতের পর রাত বাঈজী নাচ। আর আজ সেই সব কক্ষ কালের ইতিহাস হয়ে বেঁচে আছে কান্দাই নগরীর এক প্রান্তে হীরাঝিলে।

বনহুর আর মোহসীন টর্চের আলো ফেলে প্রবেশ করলো সামনের কক্ষটির মধ্যে। দরজায় পা রাখতেই কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে লাগলো তাদের।

বললো বনহুর—অনেক পুরোনো প্রাসাদের ভগ্নপ তাই এমন একটা গন্ধ লাগছে।

মোহসীন বললো—পাশের কক্ষে চলুন সর্দার।

কেন, গন্ধটা সহ্য করতে পারছো না বুঝি?

হা সর্দার, মাংস-পচা গন্ধ বলে মনে হচ্ছে আমার।

এখানে মাংস আসবে কোথা হতে তবে কোনো জীবজন্তু বা এই কক্ষে প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ করেছে এমনও হতে পারে।

বনহুর আর মোহসীন পাশের অর্ধভগ্ন কক্ষটির দিকে অগ্রসর হলো। এ কক্ষটি পূর্বের কক্ষের চেয়ে বেশি ভগ্ন এবং আগাছায় ভর্তি। এ কক্ষের সেই রকম প্রবেশ করাই দুস্কর। কক্ষের ছাদ ভেঙে ধরে পড়েছে। পরগাছা আর অশ্বথ বৃক্ষের শিকড় দিয়ে পথ রুদ্ধ।

ফিরে এলো বনহুর আর মোহসীন পূর্বের কক্ষে। কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোরে পুনরায় রওয়ানা দেবে তারা। গাড়ি থেকে কিছু খাবার এবং ফলমূল নিয়ে এলো মোহসীন তাই তারা খেলো। যদিও গন্ধটা উৎকটভাবে নাকে প্রবেশ করছিলো।

কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো ওরা।

বনহুর আর মোহসীন।

পাশে রাখলো রিভলভার আর টর্চ।

বেশ রাত হয়েছে।

চারদিকে ঝিঁঝির অশান্ত আওয়াজ। দূরে এবং আশেপাশে শিয়ালের চিৎকার।

দুজনের চোখেই ঘুম আসছে না।

মশা ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে। বনহুর বললো—মশাগুলো বহুদিন মানুষের রক্তপান থেকে বঞ্চিত, কাজেই ওরা ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত আক্রমণ করছে।

সর্দার আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না।

তুমি ঘুমাতে চেষ্টা করো মোহসীন, কারণ তোমাকে অনেক পথ গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে।

ঘুম আসছে না সর্দার।

আমিও পারছি না ঘুমাতে……

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নীরব।

মোহসীন মশার কামড় খেয়ে ছটফট করছে। বললো বনহুর—মোহসীন!

বলুন সর্দার।

জানো মোহসীন এই হীরাঝিলের কাহিনী? একদিন এ প্রাসাদ নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে থাকতো, চলতো নানা ধরনের বাইজী নাচ। কত নারীর ইজ্জত নিয়ে রাজা জয়কান্ত নারকীয় খেলা খেলেছে। কত নারীর করুণ আর্তনাদ এই প্রাসাদের কঠিন দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কত অসহায় মানুষের বুকের রক্ত জমাট বেঁধে শুকিয়ে আছে এই প্রাসাদের মেঝেতে। অনেক কাহিনীর সমাধি এই হীরাঝিল। শুনেছি কোনো এক তরুণীকে জীবন্ত পুঁতে রাখা হয়েছিলো হীরাঝিলের কোনো এক কক্ষে, জানি না কোন কক্ষ সেটা…।

বললো মোহসীন-হয়তো বা এই সেই কক্ষ যে কক্ষে সেই অসহায় তরুণীকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছিলো।

তোমার অনুমান সত্যও হতে পারে মোহসীন। কত আশা, কত বাসনা বুকে নিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে আছে সেই তরুণী যার বাসনা কোনো দিন আর পূর্ণ হবে না। জয়কান্ত বড় নিষ্ঠুর দুর্দান্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলো। একটু থেমে বললো বনহুর —একদিন যার প্রচন্ড দাপটে, পাশবিক অত্যাচারে দেশবাসীর জীবন ত্রাহি ত্রাহি করতে, আর আজ সেই জয়কান্ত কোথায়? কোথায় তার সেই অহংকার আর নিষ্ঠুর ভয়ংকর দাপট। কালের অতলে তলিয়ে গেছে সবকিছু। মোহসীন, এটা প্রকৃতির নিয়ম, আমরা ক্ষণিকের জন্য এ পৃথিবীতে আসি। জন্মাবার পর হতেই আমরা পলে পলে এগিয়ে চলি মৃত্যুর দিকে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে মুহূর্তগুলো অজান্তে শেষ হয়ে যায়, একদিন ডাক আসে পরপারের। এই সুন্দর পৃথিবীর রূপসর, মোহ মায়া মমতা সব বিচ্ছিন্ন করে চলে যেতে হয়। এমন কোনো শক্তি নেই যে শক্তি মৃত্যুকে পরিহার করতে পারে।

মোহসীন বলে সর্দার, আমরা কোনো সময় সে চিন্তা করি না। মনে করি এ পৃথিবী বুঝি আমাদের চিরকালের বাসস্থান। আমরা এখানে যা খুশি তাই করে যাবো–আমাদের ক্ষয় নেই……

নরাধম তারা, যারা মনে করে আমরা কোনোদিন মরবো না এবং মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচার করে যাবো। কোনোদিন আমাদের পতন আসবে না। রাজা জয়কান্তও তাই ভেবেছিলো কিন্তু তার সে গর্ব সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। নিষ্পেষিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস তার সমস্ত অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। জানো, অসৎ উপায়ে উপার্জন কোনোদিন স্থায়ী হয় না। তার পরিণতি এই হীরাঝিল। সৎ উপার্জন এবং সতোর কোনোদিন ক্ষয় নেই, চির অক্ষয় তারা।

বনহুর আর মোহসীন নানা কথা বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

*

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বনহুরের। একটা শব্দ কানে আসে তার, লঘু পদক্ষেপে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে মেঝেতে। বনহুর সজাগ হয়ে চোখ মেলে দেখে, একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে দরজার বাইরে বেরিয়ে গেলো। এ নির্জন পোড়োবাড়িতে মানুষ এলো কোথা থেকে। তবে কি মোহসীন পাশ থেকে উঠে গেলো? বনহুর হাত রাখলো পাশে, এই তো মোহসীন ঘুমাচ্ছে। অঘোরে।

তবে কে ঐ ছায়ামূর্তি? বনহুর উঠে বসলো এবং ঐ ছায়ামূর্তি যে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো সেইদিকে এগুলো। বনহুর বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো একটি ছায়ামূর্তি ধীর মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

তারাভরা আকাশ।

স্বল্প জ্যোছনার আলোতে দেখলো বনহুর নারীমূর্তির আঁচলখানা পেছনে লুটোপুটি খাচ্ছে। এলায়িত রাশিকৃত চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। বনহুর দ্রুত ঐ নারীমূর্তিটিকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলো।

নারীমূর্তির প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে বনহুর এমন সময় দেখলো, সামনে প্রাচীরের ভগ্নাংশ। নারীমূর্তি নেই, বনহুর প্রাচীরে বাধা পেলো, আর সে এগুতে পারলো না। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকালো, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখা গেলো না।

বনহুর ফিরে এলো।

মোহসীন ততক্ষণে জেগে উঠেছে।

সর্দারকে পাশে না দেখে সে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। এবার পদশব্দে বলে উঠলো–কে?

বনহুর বললো–মোহসীন তুমি জেগে উঠেছে?

হাঁ, সর্দার। আপনাকে না দেখে আমি খুব ভীত হয়ে পড়েছিলাম।

একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

কি ঘটেছে সর্দার।

রাত ভোর হবার বিলম্ব নেই। দূরে বুনো মোরগ ডাকছে।

বনহুর আর মোহসীন বসে বসে কথা বলছিলো।

বললো বনহুর—আশ্চর্য আমি যা দেখলাম তা সত্য বলে মনে হলেও সত্য নয়।

কি দেখেছেন সর্দার।

দেখলাম একটি নারীমূর্তি আমাদের এই কক্ষ হতে বেরিয়ে গেলো!

সত্যি?

হাঁ মোহসীন। আমি সেই নারীমূর্তিকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেলাম! নারীমূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে। এলায়িত রাশিকৃত চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর, আঁচলখানা পেছনে লুটোপুটি খাচ্ছে। তারাভরা আকাশের জ্যোছনার স্বল্পালোকে আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

তারপর কি হলো সর্দার?

দেখলাম তরুণী ভাঙাচুরা উঁচুনীচু দেয়ালের ভগ্নস্তূপ পেরিয়ে সহজেই এগিয়ে যাচ্ছে। আমিও চললাম। কিছুটা এগুতেই সামনে একটি উঁচু দেয়াল খাড়া হয়ে আছে দেখলাম। যদিও দেয়ালটা ধসে পড়েছে তবুও এত বেশি উঁচু যে ওপাশে যাওয়া ওভাবে সম্ভব নয়। আমি থমকে দাঁড়িয়ে দেখলাম আশ্চর্য, তরুণীকে আর দেখতে পেলাম না।

কি বলছেন সর্দার।

হাঁ ঠিক, তরুণীটি যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

আশ্চর্য!

হাঁ মোহসীন, আশ্চর্য বটে। আমি নিজের চোখে দেখলাম একটি নারীমূর্তি.......

বনহুরের কথার মাঝখানে বলে ওঠে মোহসীন–সর্দার, কিসের শব্দ। শোনা যাচ্ছে।

কোনো জন্তুর গলার আওয়াজ। এটা অভিশপ্ত পোড়াবাড়ী, এখানে কত রহস্য আত্নগোপন করে আছে কে জানে!

সর্দার, ভোর হয়ে গেলে বেঁচে যাই। আমার গা কেমন ছম ছম করছে। গন্ধটা আমার নাড়িভুড়িকে টেনে বের করে আনছে যেন।

বনহুর বললো–গাড়ির শব্দটা, যা আমরা প্রথমে শুনেছিলাম তা আমাদের আর বিরক্ত করলো না বলে কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

মোহসীন বললো—-এ কথা সত্যি, গাড়ির শব্দটা আর আমরা শুনতে পাইনি। নিশ্চয়ই কেউ ফলো করেও আমাদের পায়নি। সর্দার, ভোর হয়ে এলো বলে।

হাঁ, পূর্বদিক ফর্সা হয়ে এসেছে।

*

ভোর হতেই সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠলো হীরাঝিলের রাজপ্রাসাদ।

মোহসীন চিৎকার করে উঠলো ভীতকণ্ঠে–সর্দার ঐ দেখুন...আংগুল দিয়ে পাশে দেখিয়ে দিলো সে।

বনহুর দেখলো, তারা যে স্থানে শয়ন করেছিলো ঠিক তার পাশে একটি অর্ধগলিত। নারীদেহ পড়ে আছে চিৎ হয়ে। রাশিকৃত চুল ছড়িয়ে আছে মাথার চারপাশে।

বনহুর আর মোহসীন কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব নির্বাক হয়ে পড়লো। তারা রাতে যে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলো তা ঐ মৃতদেহটির তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোহসীন বললো–সর্দার, কি ভাবছেন?

বললো বনহুর—ভাবছি রাতে আমি যে নারীমূর্তিটিকে দেখেছিলাম এ সেই নারীমূর্তির লাশ।

সর্দার!

হা মোহসীন, আমি জ্যোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখেছি এই সেই নারী যার চুল ছড়িয়ে ছিলো পিঠের ওপর, যার আঁচল লুটোপুটি খাচ্ছিলো মেঝেতে। এ সেই নারী……কিন্তু একে কে এমনভাবে হত্যা করেছে। রাজা জয়কান্ত আজ নেই, নেই তার দুর্দান্ত অনুচরগণ তবে কারা একে খুন করেছে?

সর্দার, এ হত্যাকান্ড মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে, দেখছেন না ওর মাংসগুলো এখনও শরীর থেকে সম্পূর্ণ খসে পড়েনি। পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে ওর দেহটা থেকে……

হ্যাঁ, এ হত্যাকান্ড সম্প্রতি সংঘটিত হয়েছে। হীরাঝিলের রক্তের তৃষ্ণা এখনও মেটেনি……একটু থেমে বললো বনহুর—জানি না এ নারী কে? কি এর পরিচয়? আর কেনই বা একে হত্যা করা হয়েছে নির্জন হীরাঝিলের অভ্যন্তরে। মোহসীন, চলো দিনের আলোয় হীরাঝিলের ভিতরটা দেখি।

না সর্দার, এই অভিশপ্ত হীরাঝিলের অভ্যন্তরে গিয়ে কাজ নেই। ওর ভেতরে কোনো বিপদ ওৎ পেতে আছে কিনা কে জানে।

এ কথা মিথ্যা নয় মোহসীন। রাতে আমি স্পষ্ট দেখেছি একটি নারী মূর্তি আমাদের ভগ্নকক্ষ হতে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ঐ প্রাচীরটার দিকে চলে গেলো। ঐ সেই নারী যাকে মৃত অবস্থায় কক্ষে দেখলাম।

চলুন সর্দার, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত মনে করছি না। কি সর্বনাশ, একটা গলিত লাশের পাশে আমরা রাত কাটিয়েছি।

এতে ভয়ের বা চিন্তার কি আছে মোহসীন? সবাইকে একদিন মরতে হবে। তা ছাড়া একটা মৃতদেহ একটা অসাড় পদার্থ ছাড়া কিছু নয়। তবে দুর্গন্ধটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিলো।

বনহুর আর মোহসীন হীরাঝিল থেকে বেরিয়ে তাদের গাড়ি খানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

মোহসীন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—সর্দার, ঐ দেখুন একটা চিঠি। মোহসীন গাড়ির ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিলো হাতে।

বনহুর কিছুমাত্র অবাক না হয়ে মোহসীনের হাত থেকে চিঠিখানা নিলো এবং মেলে ধরলো চোখের সামনে। গাঢ় সবুজ রঙের চিঠি, লাল কালিতে লেখা দুটি লাইন।

বনহুর, সাবধান! আর অগ্রসর হতে চেষ্টা করো না। —মৃত্যুদূত।

বনহুর পকেট থেকে বের করলো একটা ভাজকরা কাগজ। কাগজখানার সংগে মিলিয়ে নিলো চিঠির লেখাগুলো, তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো সে।

মোহসীন মোটেই অবাক হলো না, সে জানে তাদের সর্দার অহেতুক এভাবে হাসবে না। নিশ্চয়ই কোনো গোপন রহস্যজাল তার চোখে ধরা পড়ে গেছে। বললো মোহসীন—সর্দার।

হাঁ, যেতেই হবে আমাকে সালিমা বনে। বনহুর কথাটা বলে চিঠি দুখানা ভাঁজ করে রাখলো পকেটে।

গাড়ির ড্রাইভ আসনে এবার বনহুর নিজে বসলো।

মোহসীন বললো—আপনি গাড়ি চালিয়ে যাবেন?

হাঁ, কারণ শত্রু আমাদের সংগে রয়েছে।

ঐ চিঠি কে লিখেছে সর্দার?

এখন নয় পরে জানতে পারবে। মিঃ নিয়াজীর পুত্র আরমানকে যে ব্যক্তি ভয় করে ইনজেকশান পুশ করে তার জীবন নিয়ে এক রহস্যময় খেলা খেলতে চেয়েছে সেই ব্যক্তির এ চিঠি।

কে সেই ব্যক্তি সর্দার?

জানতে পারবে কিন্তু এখন এ মুহূর্তে নয়।

মোহসীন গাড়ির ড্রাইভ আসনের পাশের আসনটিতে উঠে বসলো।

বনহুর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

হীরাঝিলের ভগ্নাংশ পেরিয়ে গাড়িখানা এক সময় এবড়ো থেবড়ো পথটার ওপরে এসে দাঁড়ালো। এ পথ সহজ পথ নয়, দুর্গম পথ বলা চলে। সর্দার গাড়ি চালনায় দক্ষ এ কথা মোহসীন জানে। তাই সে কোনো প্রতিবাদ না করে নিশ্চুপ রইলো।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

বনহুর অতি নিপুণতার সংগে গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

বনহুর বললো–মোহসীন, শত্রু আমার পরিচয় জেনে নিয়েছে। ভালই হলো, মোকাবেলা করতে পরিচয়ের দরকার হবে না।

সর্দার, সালিমা বন, এ নাম আমি শুনেছি। অত্যন্ত হিংস্র জীবজন্তুর বসবাস সেখানে।

হাঁ, সে কথা মিথ্যা নয়। হিংস্র জীবজন্তুর চেয়েও ভয়ংকর হলো মানুষ। মোহসীন, হিংস্র জীবজন্তু সামনে পেলে আক্রমণ করে আর মানুষ যারা নরপশু তারা আক্রমণ করে পেছন থেকে কৌশলে। হিংস্র জীবজন্তুর চেয়ে এরা ভয়ংকর। আমি এমনি এক ব্যক্তির সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাচ্ছি।

*

সারা দিন একটানা গাড়ি চালিয়ে এক সময় বনহুর আর মোহসীন হিরাগো শহরে এসে পৌঁছলো আলো ঝলমল হিরাগো বনহুরের চোখে অপরূপ রূপে ধরা দিলো।

একটি হোটেলে আশ্রয় নিলো বনহুর আর মোহসীন। রাতে একবার ম্যাপখানা মেলে নিয়ে দেখলো বনহুর। পরদিন আবার হলো তাদের যাত্রা শুরু।

হিরাগো শহর পেরিয়ে নির্জন পথ। এ পথ সালিমা বনে যাওয়ার পথ। ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে পথটা সরাইখানা হাংহার সামনে দিয়ে।

বনহুর আর মোহসীন গাড়ি নিয়ে সেই পথে অগ্রসর হলো।

বনহুরের দৃষ্টি গাড়ির সম্মুখভাগে। চোখেমুখে দৃঢ়তার ছাপ।

বললো বনহুর—মোহসীন, জানি না এ পথে আবার ফিরে আসবো কি না.......

সর্দার, হঠাৎ এ কথা কেন বলছেন? বললো মোহসীন।

বললো বনহুর—যার সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাচ্ছি সে ভীষণ ধূর্ত এবং কৌশলী। মারাত্নক এক ইনজেকশান দ্বারা সে বহু লোককে হত্যা করেছে, বহু লোককে সে পাগলে পরিণত করেছে। তার মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখন আরমান তার শিকার। মোহসীন, সেই ধূর্ত নরপশু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধন-ঐশ্বর্যের তার সীমা নেই। তবু তার লালসা আরও সম্পদ চাই এবং সে কারণেই আরমানের দেহে মারাত্মক ইনজেকশান পুশ করিয়ে তাকে নিজের করে নিতে চায়। উদ্দেশ্য আরমানকে দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করানো।

মোহসীনের দুচোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, কারণ সে এত কথা জানতো না। সর্দারের মুখে সব শোনার পর তার ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে। ভাবে কে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি......

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দূরে অনেক দূরে সেই সরাইখানা। যার নাম হাংহা।

[পরবর্তী বই হাংহার রহস্য]

পূর্ববর্তী:

« ৭.২০ মৃত্যুকূপে দস্যু বনহুর

পরবর্তী:

৮.০২ হাংহার রহস্য »